এখন ডুয়ার্স
১ মে ২০১৬। ১২ টাকা

কোচবিহার ! কোন পথে এবার ?

দীর্ঘ উপেক্ষা। সীমান্তের পাচার। সাবেক ছিট।
ফ ব ঘাঁটিতে ভাঙন। তৃণমূলি দাপট ও অন্তর্ঘাত
কী জবাব দিতে চলেছে?

বাম শরিকদ্বয়ের ডুয়ার্সের ডেরা
কি উৎখাতের মুখে?

ডুয়ার্স কন্যা রেমিকার নেপালিতে গীতাঞ্জলি অনুবাদ স্বীকৃতি পেল

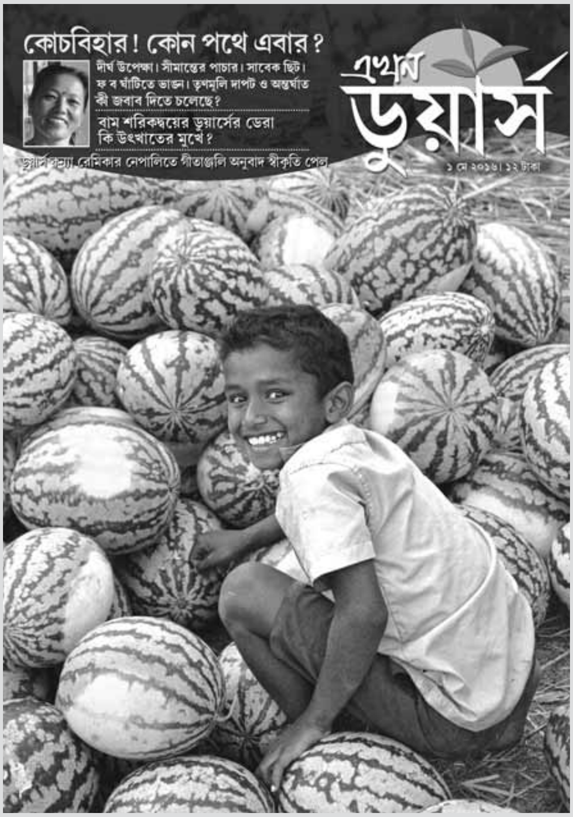

তিস্তা নদীর চরে আমি পা রেখেছি কাল
বাইরে সবুজ ভেতরখানা একেবারে লাল
বাইরে গরম রোদটা চরম তিরিক্ষি হয় হাল
ভেতরটাতে কেমন তবু রস যে বেসামাল!

তোর্ষা নদীর তীরে আমি পৌঁছে গেছি যেই
বলল নদী - ঘাম মুছে নাও, ভাবনা কিছুই নেই
দু'হাত দিয়ে তুলবে বালু, হারিয়ো না আর খেই
লাল-সবুজের এমন আদর দিলাম তোমাকেই!

জলঢাকা আজ একটু রোগা বোশেখ জুড়ে তাপ
গাছ কেটেছি পাষণ্ড সব, রোদের অভিশাপ
পুড়িয়ে দিল চামড়া আমার, কোথায় চা'ব মাপ?
নদীর কোলে আমার জন্য রসালো সন্তাপ!

গ্রীষ্ম নামে নদীর বুকে, প্রখর হল সব
শুষ্ক বালুর মধ্যে তবু সিক্ত অনুভব!

ছন্দে ঃ অমিত কুমার দে
ছবিতে ঃ জয়ন্ত গুহ

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।
এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১-১৪ মে ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৪

নির্বাচনের ডুয়ার্স
শেষবেলায় শাসক দল কি কিঞ্চিৎ উদ্‌বিগ্ন? ৫

দূরবিন
বাম-শরিকদের ডুয়ার্সের ডেরা কি উৎখাত হওয়ার মুখে? ২২

এখন ডুয়ার্স এক্সক্লুসিভ
কোচবিহার কোন পথে হাঁটবে এবার? ৮
মেখলিগঞ্জে মানুষ তাকিয়ে আছে তিস্তা সেতুর দিকে ১৫
বহু স্বপ্নের প্রতিনিধি সাবেক ছিটের ভোটাররা ১৮

পর্যটনের ডুয়ার্স
আকাশ দেখতে বক্সায় ২৪

চায়ের কাপে চোখের জল
কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলি সেই... ২৭

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৩০
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ৩৯
পাঠকের ডুয়ার্স ৪৩
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪৭

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
লাল চন্দন নীল ছবি ৩২
তরাই উৎরাই ৩৫
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩৭

শ্রীমতী ডুয়ার্স
এবারের শ্রীমতী ৪১
প্রশ্ন-উত্তর ডট কম ৪২
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪২
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৫
শখের বাগান ৪৫
টেক টক ৪৬

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী ডুয়ার্স পরিচালনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

ডুয়ার্সের কফি হাউস এখন জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা

কবিতা বা স্ক্রিপ্ট পাঠ/বৈঠক

টিভিতে ম্যাচ দেখা

সাতটি দৈনিক পত্রিকা

ওয়াই ফাই পরিষেবা

এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?

বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

বাড়িতে বসে ‘এখন ডুয়ার্স’ পেতে চান?

এখন ডুয়ার্স-এর পাঠকমহলে সাড়া ও চাহিদা দুই-ই বাড়ছে হু হু করে। এপ্রিল ১, ২০১৬ সংখ্যা থেকে জলপাইগুড়ির সঙ্গে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা ও শিলিগুড়ি শহরে বাড়িতে বা অফিসে নিয়মিত ‘এখন ডুয়ার্স’ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও অন্যান্য এলাকাতেও শুরু হবে এই ব্যবস্থা।

যাঁরা ‘এখন ডুয়ার্স’ নিয়মিত পেতে চান তাঁরা আজই ফোন করে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নং লিপিবদ্ধ করান। পত্রিকা পৌঁছবে সঠিক সময়ে। পত্রিকার দাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এজেন্টের হাতে তুলে দিতে হবে। নতুবা এককালীন বার্ষিক গ্রাহক হয়ে তাৎক্ষণিক দাম দেওয়ার ঝামেলা বিদেয় করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ২৫০ টাকার বিনিময়ে বার্ষিক গ্রাহক হলে আপনি পাবেন ২৪টি সংখ্যার কুপন। পত্রিকা দিতে আসবেন যিনি তার হাতে কুপনটি ধরিয়ে দিলেই হবে।

আজই আপনার নাম, ঠিকানা গ্রাহক হিসেবে লিখিয়ে রাখুন। ফোন করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

চায়ের কাপে চোখের জল

ডুয়ার্সের ডিশ

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

শ্রীমতী ডুয়ার্স

লাল চন্দন নীল ছবি

মাননীয় হবু বিধায়ক স্যার !

সুপ্রভাত দাদা। মানে গুড মর্নিং স্যার। আজ সক্কালবেলা চলে এয়েছি আপনার কাছে। আমরা আপনারই এলাকার মানুষ, এবার আপনাকেই ভোট দিয়েছি, গতবারও আপনাকে দিয়েছিলাম, আপনি জিতেছিলেন। এবারও আপনাকে আগাম শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি। জয় আপনার কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আসলে আমাদের অনেকগুলি পাওনা ছিল স্যার। আপনাদের তরফ থেকে যা ছিল প্রতিশ্রুতি, আমাদের পক্ষ থেকে তা ছিল চাহিদা বা দাবি বা অধিকার। সেগুলি কি এবার মনে করে একে একে দিয়ে দেবেন স্যার? আমরা জানি আপনি অনেক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন এরপর। মাঝে মধ্যেই কলকাতায় ছুটতে হবে। বিধানসভা, দলীয় মিটিং, নানা কমিটির মিটিং, অনুষ্ঠান-উদ্বোধন কত কিছু যে এসে পড়বে একসঙ্গে ভাবাই যায় না। গতবারও তো দেখলাম তাই হল। কী যে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েন আপনি যে আপনার নাগাল পাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ে।

এই তো যেমন গতবার আপনাকে জানিয়েছিলাম, আমাদের গাঁয়ে ঢোকার রাস্তায় যে ছোট্ট নদীটা পড়ে বর্ষায় সেটার চেহারা অতি ভয়ংকর হয়ে ওঠে, বাঁশের মাচার ওপর আর ভরসা করা যায় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি স্কুলে যায়, বড় ভয় করে। আপনি বরাভয় দিলেন যেখান থেকে হোক টাকা জোগাড় করে পাকা কালভার্ট বানিয়ে দেবেন। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে এত ব্যস্ত ছিলেন যে সেদিকে নজর দেওয়ার ফুরসতই পেলেন না। শুনেছি মন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল গতবার, কারা নাকি শয়তানি করে তা হতে দেয়নি। আর সেজন্যই বড্ড মনমরা হয়ে ছিলেন। খুব স্বাভাবিক, আমরাও তাই অপেক্ষা করে রইলাম পরের ভোটের জন্য।

আমাদের গাঁয়ের বাজারটাও আপনি পাকা করে দেবেন বলেছিলেন। প্রত্যেক মঙ্গল আর শুক্র হাট বসে, এখনও আশপাশের কত গ্রাম থেকে মানুষ আসে বেচাকেনা করতে। বর্ষায় বড় খারাপ অবস্থা হয় গো, কাদায় হাটু অব্দি ডুবে যায়। এঁটেল মাটি তো, হাজার বালি ফেলেও লাভ কিছু হয়নি। এটা অবিশ্যি আপনার তুলনায় খুবই ছোট কাজ, তাই হয়ত ভুলে গেছেন। এর চাইতে আরও সব বড় সমস্যা আছে গো কর্তা, সবই তো হয়ে যাবে বললেন ভোট চাইতে এসে। মনে আছে বিডিও অফিসের সামনে বটগাছটায় গোড়ায় বসে আপনি সবার সঙ্গে লাল চা খেলেন, পান খেলেন, কাউকে কাউকে সিগারেটও খাওয়ালেন? সে কত্তো হাসিঠাট্টা হল, গপ্পো করতে করতে তো সন্ধে হয়ে গেল। সব মনে পড়েছে নিশ্চয়ই? মনেই যখন পড়েছে, তখন যা যা দেবেন বলেছিলেন সেগুলিও নিশ্চয়ই মনে পড়ছে?

আরেকটি ভোটের পালা সাঙ্গ হতে চলল। আর মাসখানেক গেলেই রাজ্যে নতুন সরকার, নতুন শপথ, নতুন প্রতিশ্রুতি। রাস্তায় আবার লালবাতি, সাইরেন, পুলিশি তৎপরতা। জয়ীদের হাসিমুখ, পরাজিতদের ক্রুদ্ধ গোঙানি, দোষারোপ— চ্যানেলের মাইকগুলি মুখিয়েই থাকে— কখন কে কিছু বলবে? 'কিঞ্চিৎ বিতর্কিত হইলেই চলিবে'— সেদিনকার সন্ধ্যা মাত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অপর পক্ষের বক্তব্য, সেসব শুনে সান্ধ্য আসরে চেঁচামেচি ক্ষোভ— নৈশ ভোজনে যাওয়া পর্যন্ত অফিসফেরত মধ্যবিত্ত গেঞ্জি-বারমুডা পরে হা করে সেসব গিলবে— গিলতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত গিন্নি হাতের রিমোটটি কেড়ে না নেয়। পুত্র-কন্যা কেউই বুঝবে না তারও এ ব্যাপারে কিছু বক্তব্য ছিল— পরদিন সকালে অফিস না যাওয়া পর্যন্ত, সেই বায়বীয় পদার্থ নিষ্কাশন না হওয়া পর্যন্ত, পেট ক্রমশ ফুলতে থাকবে, ফুলতেই থাকবে।

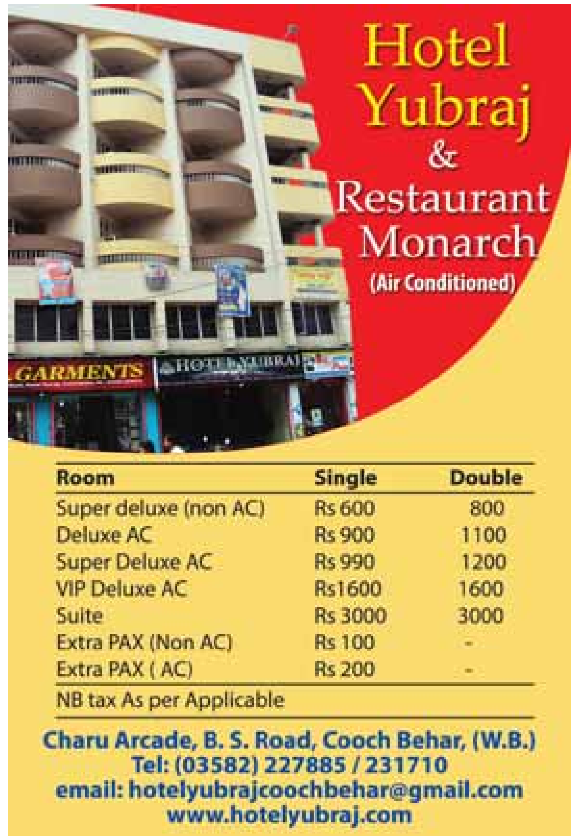

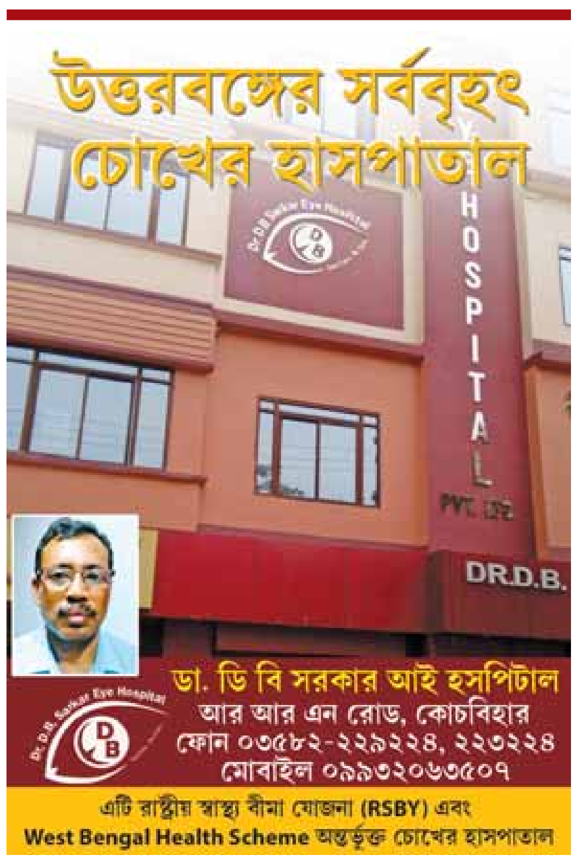

শেষবেলায় শাসক দল কি কিঞ্চিৎ উদ্‌বিগ্ন?

‘যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে, সঠিক পরিণামের দিকেই এগচ্ছে তৃণমূল দল।’

আপনি কি ভাবছেন বড় কোনও মাপের জ্যোতিষীর মন্তব্য এটি? আদৌ তা নয়। জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কের পশ্চিম রেঞ্জে মালঙ্গি বিট সংলগ্ন একটি গ্রামে পরিচিত এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলাম জমি দেখতে। না, রিসর্ট নয়, জঙ্গল সংলগ্ন কৃষিজমিতে বন্য প্রাণের দাপটে চাষবাস করা কঠিন, তাই হর্টিকালচার কিছু করা যায় কি না তা-ই নিয়ে কাজ করতে চান বন্ধুটি। সেই উদ্দেশ্যেই সস্তার জমির সন্ধান মিলেছে। জমি দেখে-টেখে ফেরার পথে বিশাল এক কদম গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখা বাঁশের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন পাকা চুল প্রৌঢ়। দু’-এক কথার পরই এসে পড়ল ভোট প্রসঙ্গ। পাশে বসে পড়তেই মুখের আগল খুললেন। ‘এলাকায় কংগ্রেস ও আরএসপি-র প্রভাব ছিল এক সময়। তৃণমূল ক্ষমতায় আসবার পর সব উলটেপালটে গিয়েছে। সবাই এখন তৃণমূল। পঞ্চায়েতের টাকা নিয়ে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, মারপিট, মায় খুনজখম দেখে বিরক্ত এলাকার মানুষ। গ্রামের কেউ মুখ না খুললেও প্রৌঢ় অকুতোভয়— সিপিএমও শুনেছি অত্যাচারের রাজনীতি করত, তবে এই এলাকায় তাদের দেখার অভিজ্ঞতা হয়নি। মমতা ক্ষমতায় আসার পরে গ্রামের মানুষের মনে আশা জেগেছিল, সে আশা যে পুরো নিবে গেছে, তাও নয়। কিন্তু তাঁর দল যেভাবে বেড়েছে এবং গত পাঁচ বছর চালিয়েছে, তার জবাব ভোটের বাক্সে পড়বেই। কৃতকর্মের ফল ওঁকে ভুগতেই হবে। উপায় একটাই। মানুষের যেটুকু আশা এখনও টিকে আছে, তাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। তার সুযোগ ওপরওয়ালা হয়ত মমতাকে একবার দেবেন, কারণ পঁচিশ বছর ধরে লড়াই ও পরিশ্রমের পর ইনাম হিসেবে মানুষ তাঁকে এই জায়গাটা দিয়েছিল।’

গ্রামীণ প্রৌঢ়ের আপ্তবাক্যের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল সে দিনই সন্ধ্যায় পুন্ডিবাড়িতে এক মিষ্টির দোকানে রোজকার আড্ডায় মশগুল জনৈক স্কুল শিক্ষকের কথায়, ‘শুরুতে জোট ছিল কাগুজে বাঘ, গুটিকয় লোকের চিন্তাভাবনায় সীমিত। তাতে ইন্ধন জোগাল মিডিয়া। সে আগুন খানিক জ্বলেই নিবে যেতে পারত। কিন্তু আশপাশেই জ্বলছিল তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষের আগুন, পাওয়া-না পাওয়ার ক্ষোভ। আর তার পাশেই মানুষের টুকরো টুকরো বিরক্তির আগুন। ক্রমশ দেখা যাচ্ছে, সব আগুন মিলেমিশে দাবানলে পরিণত হওয়ার জোগাড়। আর সেই আগুনের চেহারায় রীতিমতো ভয় পেয়েছে তৃণমূলের নেতারা।’ বামপন্থী সেই শিক্ষকের কথা তখন একপেশে মনে হলেও, পরদিন ভোরে কোচবিহার সাগরদিঘির পাড়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পূর্বপরিচিত তৃণমূল নেতার গলায় পেলাম সেই উদ্‌বেগ, ‘কী যে হবে এবার, কিছুই বুঝতে পারছি না! নিজেদের মধ্যেই এত সাবোতাজ চলছে! সব মিডিয়াই সমীক্ষায় বলেছে, কমবেশি যা-ই হোক না কেন, মমতাই ফের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন, এখন ভরসা সেইটুকুই।’

শিলিগুড়িতে দেখা হয়েছিল পুরনো এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে। তার ভাবনাচিন্তা বেশ স্বচ্ছ— ‘তৃণমূলের এহেন সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাংগঠনিক ভিত কখনওই মজবুত ছিল না তাদের। হঠাৎ করে মানুষের আশীর্বাদ ঝরে পড়ায় দ্রুত দল গঠনের তাগিদে ‘মুকুলায়ন’ ঘটে। অর্থের

সামনে কঠিন দিন আসছে, তার সংকেত তিনি পেয়ে গিয়েছেন ইতিমধ্যেই। আর সে সময় তাঁর সঙ্গে যে সেইসব নেতা পাশে থাকবেন না, সেও তাঁর অজানা নয়। ইন্দিরা গান্ধি 'ডাইনি' থেকে 'প্রিয়দর্শিনী' হয়েছিলেন কয়েক বছরের ব্যবধানে। তারও চাইতে কম সময়ে যদি তিনি মানুষের কাছে প্রোটাগনিস্ট থেকে ভিলেনে পরিণত হন, তবে তার দায়িত্ব তো তিনি এড়াতে পারবেন না।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে কেউ ঢুকে পড়তে শুরু করে এবং পদও পেতে শুরু করে। মূল তৃণমূলিরা যে কাজ করতে দু'বার ভাবত, নবাগতরা তা শুরু করে দিল অকুতোভয়ে, কারণ দলের প্রতি 'কমিটমেন্ট' তাদের কাছে আশা করাই অন্যায়। তার সঙ্গে কংগ্রেসি গোষ্ঠী কালচার, এলাকাভিত্তিক দাদাগিরি ও করেকম্মে খাওয়ার রাস্তা বাতলে দিল অচিরেই। গত পাঁচ বছর ধরে তাদের দাদাগিরি চলছে কোনওরকম বিধিনিষেধ না থাকায় এবং নেতৃত্বের খোলাখুলি প্রশ্রয়ে। আজ তাই যখন বিরোধী হুংকার তীব্রতর হচ্ছে, তখন প্রতিরোধের মুখে পড়ে 'বহিরাগত' সমৃদ্ধ দলটির সাংগঠনিক ফাঁপা বিশাল বপু থরথর করে কেঁপে উঠছে। পালটা প্রতিরোধের অভ্যাস নেই দীর্ঘ পাঁচ বছর। তাই দরদর করে ঘামা আর দিদির ভরসা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

এ যেন সেই মাসির গল্প, যে তার আদরে পালিত বোনপোকে শত কুকাজেও দীর্ঘদিন নীরবে বা সরবে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। তারপর একদিন ধরা পড়ে সেই বোনপোর যখন বিচারে কঠিন শাস্তির আদেশ হল, তখন সে পেয়াদার সঙ্গে শ্রীঘরে রওনা দেওয়ার আগে 'এক মিনিট' বলে মাসির কানে কানে 'ঠিক সময়ে যদি শাসন করতে তাহলে তোমাকে বা আমাকে এই দিনটি দেখতে হত না।' বলে এক কামড়ে তার কানটা কেটে নিল। খুবই দুঃখের কাহিনি, কিন্তু প্রশ্ন একটাই থেকে যায়— মাসি কি কান হারাবার যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতে সেই বোনপোকে একইভাবে আদর-আশকারা দিয়ে যাবে?

দিদি কি ক্রমশ একা হচ্ছেন?

যাঁরা এক সময় তাঁকে 'সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী' বলে মানতেন, তাঁরাই মজা করে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন, একদিন তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে যাবেন, তাঁর দলের মধ্যে তিনিই হবেন প্রধান বিক্ষুব্ধ। স্টিং অপারেশন নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যে নাকি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন দলের অভিযুক্ত নেতারাই। দলের মধ্যেই অনেকে বলেছেন, সত্যি কথাটাই তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। যেটা তিনি ঘরোয়া একান্ত বৈঠকে এতদিন আনঅফিশিয়ালি বলছিলেন, সেটাই যে কখন মাইকের সামনে বলে ফেলেছেন তা খেয়াল করেননি। চরম বিরক্তি টানা চেপে রাখলে তা এইরকম হঠাৎ ফসকে বেরিয়ে পড়ে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, সত্যিই কি তিনি ক্লান্ত, পর্যদুস্ত তাঁর সেনাবাহিনীকে নিয়ে? আগে থেকেই নানা অভিযোগে অভিযুক্ত বেশ কিছু প্রার্থীকে তিনি এবার মনোনয়ন দিয়েছেন নিশ্চিন্ত রূপে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই। জিতে গেলে কৃতিত্ব তাঁর, মানুষ তবু ভোট দিয়েছে বলে। আর হেরে গেলে ঘাড় থেকে বোঝা আপনিই নেমে যাবে, তাঁর দিকে আঙুল তোলার বা আবার কোনও সুযোগ পাওয়ার প্রশ্নই নেই।

নিজের দলের সেনাপতিদের নিয়ে সবচেয়ে বিরক্ত তিনি নিজেই, তাঁদের ওপর বিশ্বাস-ভরসা কখনওই করেন না— এ তো কারও জানতে বাকি নেই। একা একা দল চালানো যায় না, বিশেষ করে ক্ষমতায় থাকলে তো নয়ই, তাই চরম অপছন্দ সত্ত্বেও তাঁকে দলে নিতে হয়েছে বহু নেতাকে। যাঁরা এক সময় ক্ষমতার ভাগীদারি না পেয়ে মাঝপথে ছেড়ে চলে যেতে বা তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই বিষোদ্‌গার করতে, এমনকি তাঁর বাড়িতে দলবল নিয়ে ইট ছুড়তেও দ্বিধা বা সংকোচ করেননি, আবার তাঁদেরকেই দেখা গেছে পুচ্ছ আন্দোলিত করে টিকিটের লোভে তাঁর দরজায় এসে দাঁড়াতে। অসীম সহ্যক্ষমতায়, নাকি পরম মমতায়— কোনও জাদুশক্তিতে তিনিই তাঁদের আবার ঘরে ডেকে নিয়েছেন!

সামনে কঠিন দিন আসছে, তার সংকেত তিনি পেয়ে গিয়েছেন ইতিমধ্যেই। আর সে সময় তাঁর সঙ্গে যে সেইসব নেতা পাশে থাকবেন না, সেও তাঁর অজানা নয়। ইন্দিরা গান্ধি 'ডাইনি' থেকে 'প্রিয়দর্শিনী' হয়েছিলেন কয়েক বছরের ব্যবধানে। তারও চাইতে কম সময়ে যদি তিনি মানুষের কাছে প্রোটাগনিস্ট থেকে ভিলেনে পরিণত হন, তবে তার দায়িত্ব তো তিনি এড়াতে পারবেন না। কারণ, দস্যু রত্নাকরের গল্পর মতোই সে 'পাপ'-এর দায় তাঁর দল বা পরিবার কেউই নিতে রাজি থাকবে না। সে জন্যই বোধহয় প্রচারাভিযানে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, কাউকে নয়, ২৯৪ কেন্দ্রেই প্রার্থী আমি, আপনারা আমাকে ভোট দিন।

নিজের ইমেজ পুনরুদ্ধারেই বোধহয় এরকম একা হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করছেন তিনি।

বিরোধীদের মুখ কে?

মমতার প্রসঙ্গ উঠলেই দেখা যায়, বিরোধীদের মুখ কেমন যেন বিকৃত হয়ে যায়। কাউকে মনে হয় তাঁর কথা বলতে বলতে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন, আবার কাউকে মনে হয়, এত বড় শত্রুতা জীবনে কারও সঙ্গে কখনও হয়নি। কেউ আগে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতেন, এখন এমন ভাব করেন, যেন বিধাতা এমন ভুল বোধহয় আগে কখনও করেননি। কেউ কেউ দেহভঙ্গিমায় বুঝিয়ে দেন, এই শত্রুতা জন্মজন্মান্তর ধরে চলবে। আগে যিনি

মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি তো আবার নামটাই মুখে আনতেন না। আর চুনোপুঁটিরা, যাঁরা টিভির পর্দায় সান্ধ্য আসরে বসেন, তাঁদের হাবভাবে এমন তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়, যেন এত বড় 'ভয়ংকর অর্বাচীন' আগে কখনও কেউ দেখেনি।

আবার কোনও কোনও বুদ্ধিদীপ্ত আড্ডায় তিনি আগাগোড়াই যাবতীয় হাসির খোরাক। শিক্ষক শ্রেণির কাছে তিনি অশিক্ষিত, সংস্কৃতিজগতের লোক তাঁকে এড়িয়ে চলেন দৃশ্যতই। প্রশ্নটা ওঠে এইখানেই— এই বিরোধীময় রাজ্যে তাঁর বিরোধী মুখ কোনটি? ২০০০ সাল থেকেই বা তার আগে জ্যোতিবাবুর জমানা থেকেই তাঁকে যেমন বিরোধী মুখ হিসেবে ভাবা শুরু হয়েছিল, তার উত্তরণ ঘটে '১১ সালে। দু'হাজার সালে মমতা প্রস্তুত থাকলেও টানা দশ বছর বুদ্ধর নেতৃত্বই পছন্দ করেছিল বাংলার মানুষ। এখন রাজ্য জুড়ে মমতার সরকার বিরোধী হাওয়া বইছে ঠিকই, কিন্তু বিরোধী মুখ নেই। অনেকে মিলে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন, হটাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সমতুল্য কোনও মুখ তুলে ধরতে পারেননি, যাঁকে রাজ্যের মানুষ বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবে ভাবতে শুরু করতে পারেন।

রাজনীতির থিঙ্ক ট্যাঙ্করা বলেন, রাজ্যে দীর্ঘ শাসনকালে সিপিএম কখনও নতুন নেতৃত্ব গড়ার ব্যাপারে মনোযোগ দেয়নি। আর তার ফল এখন যে কেবল তাঁরাই ভোগ করছেন, কেবল তা-ই নয়, গোটা বাংলা তার অভাব বোধ করছে। বিধান রায় বা প্রফুল্ল সেনের আমলে জ্যোতি বসু, অজয় মুখোপাধ্যায়ের মতো মুখ তৈরি হয়েছিল বলেই বাংলা তাঁদের নেতৃত্ব সাদরে গ্রহণ করেছিল। সে সময় জ্যোতি বসু ছিলেন বিরোধীদের মুখ। জ্যোতিবাবুর পরে এবং মমতার আগে দীর্ঘ সময় তেমন কোনও বিরোধী মুখ ছিল না।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলেও কি আবার প্রমাণিত হবে সেই সত্য? সুযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া বাংলার মানুষ রায় বদলান না!

পঞ্চায়েত স্তরে দখল না পেলে কি গদি দখল করা যায়?

দিনহাটা-সিতাইতে কি এবার তৃণমূল প্রার্থী জিততে পারবে? দুটো আসনেই ঘাসফুল চিহ্নে দাঁড়িয়েছেন পূর্বতন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা। তার মধ্যে একজন আবার সদ্য প্রাক্তন এবং সাম্প্রতিক দলবদলের রাজনীতিতে রেজ্জাক মোল্লার চাইতেও এগিয়ে। বলাই বাহুল্য, তিনি দিনহাটার সর্বশেষ বিধায়ক উদয়ন গুহ। দিনহাটার মানুষ তো উদয়নের শিবির বদলকে ভাল চোখে নেননি! নানাবিধ উত্তরের মধ্যে একটি কিন্তু চমকপ্রদ— আরে ভাই, শহরের ভোট নিয়ে কেউ ভাবে না। দিনহাটা-সিতাইয়ে মোট ৩৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সব ক'টিই তৃণমূলের দখলে। প্রত্যেক প্রধানকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তাঁর বুথে লিড না থাকলে আসন্ন পঞ্চায়ত নির্বাচনে মনোনয়ন পাবেন না। এর পরে উদয়নের জয় নিয়ে অনিশ্চয়তা কিছু থাকতে পারে কি?

সে দিনকার সেই ভদ্রলোক তৃণমূল সমর্থক ছিলেন কি না জানা নেই, পাঠক অতিশয়োক্তি বলেও উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু পঞ্চায়েত স্তরই ক্ষমতা দখলের উৎস, সে নিয়ে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না। প্রভূত জনসমর্থন ও মিডিয়ার সহযোগিতা সত্ত্বেও ২০০৬ সাল পর্যন্ত বারবার হেরে গিয়ে মমতা এই সত্য মজ্জায় উপলব্ধি করেছেন। তারপর অপেক্ষা করেছেন পঞ্চায়েতের রায়ের জন্য। ক্ষমতায় বুঁদ স্থানীয় বাম-নেতাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। ২০০৮ সালে বামেদের যাবতীয় অঙ্ক তছনছ করে দিয়ে মমতা যে দিন পঞ্চায়েত রাজ্যে ভাগ বসালেন, সে দিনই সূচনা হয়ে গেল বাম-রাজত্ব ধ্বংসের। হাজার চেষ্টাতেও যা আর মেরামত করা যায়নি।

আজকের জোটগর্জনে গুপ্ত গহ্বর থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসা পীড়িত বাম-সমর্থকদের উদ্দীপ্ত মিছিল দেখেও কিন্তু ধীর-স্থির বর্ষীয়ান সিপিএম নেতারা তাই বলছেন, 'এবারের নির্বাচনে লড়াইটা আসলে মহড়ামাত্র, জেতা-হারার চাইতেও এবার বেশি গুরুত্বপূর্ণ ময়দানে গা গরম করা। একশো মিটারের স্প্রিন্ট নয়, আমাদের লক্ষ্য লম্বা রেসে শামিল হওয়া। পঞ্চায়েত নির্বাচন খুব বেশি দেরি নেই— কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করার সুবর্ণ সুযোগ মিলেছে এই নির্বাচনে।' আরও একবার কংগ্রেসের ঘাড়ে চেপে সেই ওয়ার্ম-আপটা সেরে ফেলতে চাইছেন তাঁরা। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কৌশল যে আজও অকৃত্রিম সত্য।

> পীড়িত বাম-সমর্থকদের উদ্দীপ্ত মিছিল দেখেও কিন্তু ধীর-স্থির বর্ষীয়ান সিপিএম নেতারা তাই বলছেন, 'এবারের নির্বাচনে লড়াইটা আসলে মহড়ামাত্র, জেতা-হারার চাইতেও এবার বেশি গুরুত্বপূর্ণ ময়দানে গা গরম করা। একশো মিটারের স্প্রিন্ট নয়, আমাদের লক্ষ্য লম্বা রেসে শামিল হওয়া। পঞ্চায়েত নির্বাচন খুব বেশি দেরি নেই— কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করার সুবর্ণ সুযোগ মিলেছে এই নির্বাচনে।'

মিডিয়ার সংঘবদ্ধ জোট প্রচার নাকি শেষবেলায় তৃণমূলকে ঐক্যবদ্ধ করছে?

মাথাভাঙার এক পঞ্চায়েতপ্রধান সাম্প্রতিকতম দলীয় মিটিং-এ যে কথা বলেছেন, তাতে সম্মতি জানিয়েছেন উপস্থিত সবাই— 'আমরা একই দলে ক্ষমতা দখলের জন্য নিজেদের মধ্যে ক্যাঁচাল করছি, বাইরে সবাই দেখে মজা পাচ্ছে, আমাদেরও লজ্জা নাই। নিজের দলেরই আরেক প্রার্থীকে হারাবার জন্য দিনরাত প্ল্যান করছি, কারণ আমাকেও হারাবার প্ল্যান নিশ্চয়ই অন্য কেউ করছে। এরকম করে পুরো দলটাই যদি হেরে ভ্যানিশ হয়ে যায়, তখন আমাদের এই ক্যাঁচালের কী হবে? বিরোধীরা যখন এই পঞ্চায়েত অফিসটা দখল করবে, তখন আমরা কোথায় যাব? মার খাওয়ার ভয়ে আবার আগের মতোই লুকিয়ে বেড়াব?'

পঞ্চায়েতপ্রধানের এই আওয়াজ নাকি শোনা যাচ্ছে এখানে-সেখানে অন্যত্র। জোটের বাড়াবাড়িতে কোথাও সত্যিই ঘাবড়ে গেছে তৃণমূল। খোদ নেত্রীকে নির্বাচন কমিশনের শোকজ— রটতে শুরু হয়েছে নানা ভুলভাল গুজব— পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিতভাবে। এই অবস্থায় বহু জায়গায় নানা জায়গায় কোঁদল ভুলে নেতারা মাঠে নামছেন। ক্ষমতায় না থাকলে পিঠ বাঁচানো যাবে না, হারলে বিরোধী দল যে রবীন্দ্রসংগীত শোনাবে না, সে কথা ভেবে আঁতকে উঠছেন অনেকেই।

তবে তারই মধ্যে যাঁরা জয়ের আশায় মগ্ন হয়ে আছেন, অন্যের শ্রীবৃদ্ধিতে নিজের জমিদারিতে ব্যাঘাত হতে পারে ভেবে ক্রমাগত সতীর্থকে কাঠি করে যাচ্ছেন নিজের সুচতুর কৌশলের পরিচয় দিয়ে, তাঁদের কথা অবশ্যই একেবারেই আলাদা। বস্তুত তাঁরা স্বমহিমায় বিরাজমান আছেন বলেই বোধহয় মিডিয়া বা বিরোধী পক্ষ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারে, কাউকে দরকার নেই, তৃণমূলকে শেষ করতে তৃণমূল একাই যথেষ্ট।

উত্তরায়ণ সমাজদার

এখন ডুয়ার্স এক্সক্লুসিভ

কোচবিহার !

কোন পথে হাঁটবে এবার ?

নির্বাচনের শেষ পর্বে রাজ্যের প্রান্তিক জেলাটি ভোটের রঙ্গরসে আদৌ কতটা মজে আছে? সীমান্তের নানা সমস্যায় জর্জরিত চির উপেক্ষিত পিছিয়ে পড়া এই জেলাটির নাম গত কয়েক বছর ধরে খবরের কাগজের পাতায় এসেছে শাসকদলের গোষ্ঠীবাজির জন্য। তেমনই ফরওয়ার্ড ব্লকের পীঠস্থান বলে পরিচিত এই জেলাটিতে বারবার খণ্ডিত হয়েছে কমল গুহর নামে খ্যাত বাম-শরিকদল, শিরোনামে উঠে এসেছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেওয়ায়। সব মিলিয়ে কতটা দ্বিধান্বিত জেলার মানুষ, তারই খোঁজ নিয়েছে 'এখন ডুয়ার্স'।

প্রতিবেদক: জয়ন্ত গুহ

নাটাবাড়িতে রবিচ্ছবি

বলরামপুর রোড ধরে বানিয়াদহ নদী পেরিয়ে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে থামলাম। নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী তামসের আলিকে খুঁজছি। এক সময় নাটাবাড়ি ছিল সিপিএম-এর খাস তালুক। '৭৭ থেকে পরপর পাঁচবার জিতেছিলেন সিপিএম-এর শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ২০০১-২০০৬ বিধানসভায় তামসের আলি। আসার পথে রাস্তায় লাল পতাকা প্রায় চোখেই পড়েনি।

মিষ্টির দোকানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন এক ভদ্রলোক। তামসের আলির খোঁজ করতেই তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, 'উনি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। একটু এগিয়ে এসেছেন আপনারা। দাঁড়ান, ফোন করছি আমি।' তেষ্টা এবং খিদে দুটোই পেয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে দোকানে ঢুকেই দেখি বোমা সাইজের টাটকা রসগোল্লা। খেতে খেতে নিচু স্বরে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হাওয়া কী বোঝেন? কে জিতব?' চাপা স্বরে তিনি বললেন, 'রবি ঘোষই জিতব, যদি মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে। আর যদি সামলাইতে পারে গোষ্ঠীকোন্দল।' 'সে কী! তৃণমূল জেলা সভাপতি নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের গোষ্ঠীকোন্দলে কাত?' 'আর বইলেন না। মাথা খারাপ হইয়া গ্যাছে মানুষটার। অর নিজের বিরুদ্ধেও এখন গোষ্ঠী আছে।'

দু'টি ছেলে বাইক নিয়ে এসে দাঁড়াল। তামসের আলি পাঠিয়েছেন। গাড়ি ছুটল ওদের পিছুপিছু। পাকা রাস্তা ছেড়ে ধুলো ভরা কাঁচা রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর একটা ছোট্ট গ্রামে তামসের আলির দেখা পেলাম।

আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। পৌঁছাতেই নিজের গাড়িতে চড়ে আমাদের অনুরোধ করলেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।' প্রায় ৩/৪ কিমি গাড়ি চলার পর পৌঁছালাম বাংলাদেশ লাগোয়া গ্রাম শোলধুকরি।

গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বাড়ির উঠোনে তখন চূড়ান্ত উত্তেজনা। বাড়ির মহিলাদের অভিযোগ, আগের দিন রাতে তৃণমূল বাহিনী হামলা চালিয়েছে। মুম্বই থেকে ঘরে ফেরা নূরউদ্দিন বাড়িছাড়া। প্রতিবারের মতো এবারও সিপিএম-এর বুথ এজেন্ট হিসেবে বসার কথা ছিল নূরউদ্দিনের। হামলার নেতৃত্বে ছিল তৃণমূলি সামিউল। এফআইআর করার প্রতিশ্রুতি দিলেন তামসের আলি। বাড়ি থেকে বাইরে আসতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন প্রৌঢ় মানুষ এগিয়ে এসে অভিযোগ জানালেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সিপিএম করার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ঘরছাড়া।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা শুরু হল তামসের আলির সঙ্গে। গলায় আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'তিরিশ হাজারের বেশি ভোটে জিতব। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।'

গাড়িতে উঠতে উঠতে শুনলাম, চাপা স্বরে গ্রামবাসীরা বলছে, 'এরা চলে গেলেই আবার হামলা শুরু হবে।'

আগের রাতে তৃণমূল বাহিনীর হামলার বিবরণ শুনছেন নাটাবাড়ি কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী তামসের আলি।

ফব রবে নীরবে

হ্যাঁ, নীরবেই তো থাকবে ফব। কী আর করার আছে! ফব-র বাঘ এখন সার্কাসের বাঘ। ঘোঁত করিতে বলিলে ঘোঁত করে, নচেৎ খাঁচায় শুয়ে লেজ নাড়ায়। এমন একটা ভাব যে— এই-ই আমি কিন্তু বাঘ। 'জাগিয়া উঠিলে' খ্যাঁক করে ধরব। কিন্তু কমল গুহর মৃত্যুর পর ফব-র বাঘ আর জাগে নাই। এমনকি দিনহাটায় যে দিন বুদ্ধর পুলিশ গুলি চালাল, মৃত্যু হল নিতান্ত গরিব ফব কর্মীদের, সে দিনও বাঘের মুখ ভাঙেনি। গর্জে ওঠার বদলে সে দিন তারা বুদ্ধের শরণাগত হয়েছিল। দিনহাটায় মানুষ সে দিন বুঝেছিল, বাঘ আর বাঘ নাই। বাঘ গরিব মানুষের পাশেও নাই। বুদ্ধর পাশে আছে।

২০০৮-এর সেই গুলিচালনার কেস নিয়ে অন্য গল্পও আছে, যা থেকে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে, কী করে ২০১১-র প্রবল তৃণমূল হাওয়াতেও দিনহাটাতে গুহ পরিবারের পুনরুত্থান ঘটেছিল। ২০০৬-এ ফব-র খাস তালুকে উদয়ন হেরে গিয়েছিলেন তৃণমূলের অশোক মণ্ডলের কাছে। সম্ভবত মমতা বুঝতে পেরেছিলেন, দিনহাটাতেও তৃণমূল তাহলে ধস নামাতে পারে। এর পর ২০০৮-এর ৫ ফেব্রুয়ারি দিনহাটা এসডিও অফিসে উদয়নের শক্তি প্রদর্শন। পাঁচ ফব কর্মীর মৃত্যু। বিচারপতি নারায়ণচন্দ্র শীল কমিশনের রিপোর্ট। সম্ভবত রিপোর্টে নাম আছে উদয়ন গুহ, নৃপেন রায়-সহ অন্য ফব নেতাদের। অভিযোগ কংগ্রেস বিধায়ক কেশব রায়ের। দীর্ঘ তিন বছর গুলিচালনার ঘটনা নিয়ে চুপচাপ থাকার পর ২০১১-য় সরকার পরিবর্তনের পর শোনা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে শীল কমিশনের ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন করে কোনও তদন্তের নির্দেশও দেননি মমতা, এবং ২০১১-য় উদয়ন দিনহাটা থেকে জেতেন ফব প্রার্থী হিসেবেই। মিহির গোস্বামীর মতো নেতাকে মমতা সেবার দিনহাটা থেকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। মিহিরবাবু রাজি না হওয়ায় সহজে জিতে যান উদয়ন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের দু'বারের বিধায়ক, প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা, ২০১১-য় নির্দল প্রার্থী ফজলে হক। সমীকরণ আরও পরিষ্কার হয়। বলা যেতে পারে, মিহির গোস্বামী না দাঁড়ানোয় দিনহাটা থেকে ফব'কে অস্তিত্বহীন করে দেওয়ার ফাইল তৈরি হয়ে যায়। ফব এবং গুহ লিগ্যাসি দিনহাটাতে হেরে গেলে কোচবিহারে বামপন্থী প্রায় নিশ্চিহ্ন। মমতার মাস্টারস্ট্রোকে এবার গুহ লিগ্যাসি বর্তমান কিন্তু তৃণমূলের দিকে। বাম-কং জোটের ভোট কাটবেন প্রাক্তন কংগ্রেসি নেতা, নির্দল প্রার্থী ফজলে হক। একঘরে অভিমানী ফব— নীরবে তব। ২০১২ থেকে দলে দলে ফব-আরএসপি কর্মীরা যোগ দিয়েছে তৃণমূলে। পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ এবং দিনহাটাকে ঘিরে থাকা ফব গ্রাম তৃণমূলের দখলে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ফব-র চূড়ান্ত নিষ্ক্রমণের। যদি না কোনও অঘটন ঘটে।

'সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না'-র তত্ত্বে গুহকুলের বাঘ এখন জোড়াফুলের বাগানে। রক্তপাতহীন একটি কৌশলী যুদ্ধে ফব-র গুহ লিগ্যাসি শেষ। ইন্দ্রপতন না হলে শুরু থেকে চলেছে গুহ লিগ্যাসি সিজন টু তৃণমূলের সঙ্গে।

সবই তো হল, কিন্তু কোচবিহার জেলায় মমতার রবির দশা তৃণমূলের চিন্তার বিষয় হলেও হতে পারে। তৃণমূলে উদয়ন উদয় কি ভালো চোখে নেবেন তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ? শোনা যায়, দিনহাটা কেন্দ্রে যাতে সেমসাইড গোল না হয়, সে জন্য মমতা রবি-উদয়নকে ডেকে বৈঠকও করেছেন। কিন্তু এতেই কি রবির দশা ভাল হবে মমতার?

ফব এবং গুহ লিগ্যাসি দিনহাটাতে হেরে গেলে কোচবিহারে বামপন্থী প্রায় নিশ্চিহ্ন। মমতার মাস্টারস্ট্রোকে এবার গুহ লিগ্যাসি বর্তমান কিন্তু তৃণমূলের দিকে। ইন্দ্রপতন না হলে শুরু থেকে চলেছে গুহ লিগ্যাসি সিজন টু তৃণমূলের সঙ্গে। কিন্তু তৃণমূলে উদয়ন উদয় কি ভালো চোখে নেবেন তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ? শোনা যায়, দিনহাটা কেন্দ্রে যাতে সেমসাইড গোল না হয়, সে জন্য মমতা রবি-উদয়নকে ডেকে বৈঠকও করেছেন।

আদাবাড়ি ঘাটের সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। সিতাই থেকে ১৬ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে মহকুমা শহরে আসতে সময় লাগবে মাত্র আধঘণ্টা।

সেতুবন্ধনে সিতাই

দিনহাটায় যখন ঢুকেছিলাম, তখন মাথার উপর সূর্য। বাতাস নেই, কিন্তু একটু হাঁটলেই ঘেমে জল। রোদে পুড়ে, ঘামে ভিজে গোসানিমারি যাওয়ার আগে চায়ের দোকানে ঢুকলাম। দোকানে কেউ নেই। দোকানি অরুণ রায় গরমের ক্লান্তিতে ঢুলছেন। 'কী? হাওয়া কী বুঝছেন?'— চায়ের গেলাস ঠক করে টেবিলের উপর রেখে মৃদু হেসে বললেন, 'ব্রিজের উপর ফুল ফুটব, বাকি সব জলের তলায়।' আমি চমকে চোদ্দো, হতভম্ব। বন্ধু প্রদীপ্ত একটা ছোট বিষম সামলে নিয়ে স্বভাবোচিত এক মুখ হাসি হেসে বলল, এই হচ্ছে কোচবিহার জয়ন্ত। অনেক বড় সুখ-দুঃখের গল্পকেও বলতে পারে এক লাইনে। তুমি ইতিমধ্যেই ঢুকে গিয়েছ সিতাই বিধানসভায়। সিতাইয়ে সেতুই সবচেয়ে বড় নির্বাচনী ইস্যু। অরুণবাবু তখন মিটিমিটি হাসছেন। বাইরে বেরিয়ে এসে চারদিক ভাল করে তাকাতে দেখি নির্বাচনী পোস্টারে কেশব রায়, জগদীশ বসুনিয়া, ভবেন রায়— সবাই হাসছেন। 'আপনার রসবোধ দেখছি প্রবল অরুণবাবু।' একটুও না ভেবে উত্তর দিলেন, 'ব্রিজে ওঠার অপেক্ষা। উঠলেই গড়াইয়া পড়ব নদীর জলে।' প্রাণ খুলে একসঙ্গে সবাই মিলে হেসে উঠলাম। বাইরে বেরতেই এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস প্রাণ জুড়িয়ে দিল। নদী যেন দু'হাত বাড়িয়ে ডাকছে গল্প করার জন্য।

দোকান থেকে বেরিয়ে আনমনে হাঁটছি আর ছবি তুলছি। ঢলে পড়া সূর্যের হলুদ আলোয় রাস্তার দু'পাশে ফব-তৃণমূলের সারি সারি ছোট পতাকা এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে দোষারোপের মতো। রাস্তার দু'পাশের গাছ থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ছে চাপা স্বরে বলা অনেক কথা। হাওয়ার ফিসফিসানিতে বহু দিনের হারানো সুখস্মৃতি-ভালবাসা ফিরে পাওয়ার গল্প।

হাঁটতে হাঁটতে গোসানিমরির কামতেশ্বরী মন্দিরের সামনে। মন্দির চত্বরে ঢুকে এদিক-ওদিক ঘুরছি। হঠাৎ একদল তরুণ হইহই করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল। আলাপ হল অশোক বর্মনের সঙ্গে। এবারই প্রথম ভোট দেবে। 'হাওয়া কী বুঝছ? কত ভোটে জিতবে এবার কংগ্রেস?' 'কংগ্রেস কোথায় দাদা? সব এখন তৃণমূল। আর ফব।' এখানে জমি দখলের লড়াইয়ে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে আরএসপি আর ফব। তাদের বেশির ভাগটাই এখন তৃণমূলে। 'বাড়ি কোথায়?' 'সিতাই। আমরা থাকি নদীর ওপারে। মামার বাড়িতে এসেছি। ব্রিজ হয়ে গেলে রোজ আসব।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই পিছন থেকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বুঝছেন? নমস্কার।' 'আপনি?' 'আমি মানিক রায়। চায়ের দোকানের অরুণদার কাছে আপনাদের কথা শুনলাম।' 'তা বেশ তো। চলুন নদীর ধারে যাই। ব্রিজ কত দূর এগল?' 'প্রায় পুরোটাই হয়ে গিয়েছে। আর একটু বাকি আছে। শেষ হলেই আমার বিয়ে হবে।' চমকে উঠে ওঁর দিকে তাকাতেই বললেন, 'চলেন, চলেন। নদীর ধারে তরমুজ খেতে খেতে কথা হবে। আদাবাড়ি ঘাটের তরমুজ বিখ্যাত।'

নদীর ধারে গিয়ে দেখি, বিশাল এক দক্ষযজ্ঞ প্রায় শেষের মুখে। মানসাই বা সিঙ্গিমারি নদীর উপর দীর্ঘ সেতু প্রায় শেষের মুখে। ২০১১ সিতাই বিধানসভা নির্বাচনে এই সেতু ছিল প্রধান ইস্যু। সেবার ফব প্রার্থী দীপক রায় বলেছিলেন, নির্বাচন ঘোষণা না হলে ব্রিজের কাজ শুরু হয়ে যেত। বাম-জোট ক্ষমতায় এলেই শুরু হবে কাজ। যদিও ২০০৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি ভিত্তিপ্রস্তর বসিয়েও সেতুর কাজ শুরু হয়নি। কমল গুহ তখন মারা গিয়েছেন। ফব দ্বিধাবিভক্ত। ৩৪ বছর ধরে প্রতিশ্রুতি এসেছে। ভোটের পর সবাই ভুলে গিয়েছে। সিতাইয়ের মানুষ ব্রিজের অপেক্ষায় থেকেছে। বারবার ভোটে জিতিয়েছে বাম-জোটকে, কিন্তু একটা সেতু তাদের কাছে ছিল স্বপ্ন।

কোচবিহারের সাংসদ হিতেন বর্মন, নৃপেন্দ্রনাথ রায় লোকসভায় সেতুর দাবি তুলেছেন। ঠারেঠোরে দু'জনেই লোকসভায় বুঝিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেতু তৈরি বা সম্পূর্ণ করার জন্য কোনও সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে না। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি। কেউ কখনও এগিয়ে এসে সেতু তৈরির কাজে হাত দেয়নি। কিন্তু স্বপ্ন দেখিয়েছে। ভোটের পর সব তলিয়ে গিয়েছে নদীর জলে।

২০০২ সাল। নদী পেরিয়ে কেউ ওপারে যেতে চায় না। ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে তখন আদাবাড়ি ও নাফারজান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভূতের বাসা। ভাঙাচোরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তখন গোরু-ছাগল চরে বেড়ায়। নৃপেন্দ্রনাথ রায় তখন বিধায়ক এবং ২০১৬-য় সিতাই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ বসুনিয়া তখনকার পঞ্চায়েত সদস্য। স্বাস্থ্যকেন্দ্র শুধু খাতায়-কলমে। আসলে কোনও অস্তিত্বই নেই। লোক নেই। নদী পেরিয়ে সে দিন রাজ্য সরকারের কানে ঢোকেনি। সন্তানসম্ভবা বা হৃদরোগে আক্রান্ত মানুষজনকে নদী পেরিয়ে বা ঘুরপথে মাথাভাঙা হয়ে ১৭৫ কিমি অতিক্রম করে শিলিগুড়ি আনতে আনতেই তাদের মৃত্যু ঘটত। এরা অধিকাংশই দিনের পর দিন বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছিল, একটা সেতুর আশায়— কিন্তু ৩৪ বছরে 'কেউ কথা রাখেনি'। শীত বা গ্রীষ্মে যাঁরা পায়ে হেঁটে নদী পারাপার করতেন, তাঁদের পেরতে হত অন্তত ৮ থেকে ১০টি বাঁশের সাঁকো। শুকনো নদীর বুকে জায়গায় জায়গায় জমে থাকা জল— অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো এবং অবহেলায় পড়ে থাকা দীর্ঘদিনের এক প্রত্যাশা। সিপিএম, সিপিআই, ফব, কংগ্রেস— প্রত্যেকে বাণী এবং প্রতিশ্রুতিতে গরম করেছে আদাবাড়ি ঘাট। এমনকি সোমেন মিত্র পর্যন্ত এসেছিলেন ২০০৭-এ, এলাকা গরম করতে। তাতে তৎকালীন

বিধায়ক ফজলে হকের মুখরক্ষা হলেও সেতুবন্ধন কিন্তু হয়নি।

২০১১ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী কেশব রায় নির্বাচনের আগে দাবি করেছিলেন, 'তৃণমূল ক্ষমতায় এলে ব্রিজ তৈরি হবেই।' নির্বাচনে জিতে যান কেশব রায়। কী আশ্চর্য! ৩৪ বছরেও যে কাজ শুরু হয়নি, ২০১৪-য় তার কাজ শুরু হয়ে গেল জোরকদমে। স্বাধীনতার ৬৬ বছর বাদে অবশেষে শুরু হল সেতুর কাজ। সিতাই ব্লকের ১০,০০০ মানুষের কাছে এ যেন স্বপ্নের মতো।

'নেন। তরমুজ খান।' পাশে এসে বসলেন মানিক রায়। 'বিয়ে কবে? নেমন্তন্ন করবেন তো?' 'নিশ্চয়ই। আমি নিজে গিয়া আপনারে নেমন্তন্ন করে আসব। ব্রিজ শেষ হলেই আমার বিয়ে। মূলত চাষবাসই আমাদের সম্বল, কিন্তু ব্রিজ না থাকায় আমরা যেন পশ্চিমবঙ্গে থেকেও বাংলাদেশের বাসিন্দা ছিলাম। বর্ষাকালে এই নদী কী ভয়ংকর তা যদি দেখতেন একবার। প্রাণের মায়াদয়া না রেখেই নদী পেরনো কিংবা ঘুরপথে আমরা খুব ভুগেছি। লোকজন দু'বার ভাবত নদীর ওপারে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনে।' 'তাহলে এখানে পাল্লা ভারী কোন দিকে?' 'সবাই তো বলছে, আমরাই বানিয়েছি ব্রিজ।' একটুও না ভেবে মানিকবাবুর জবাব, 'মানুষ কি বোকা নাকি? নিজের চোখেই তো সব দেখসে।' মাঝখানে থামিয়ে বললাম, 'ফব তো এই ব্রিজের জন্য অনেক চেষ্টা করেছে।' মানিকবাবু তরমুজের একটা আধ খাওয়া অংশ মাটিতে ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'লেকচার দিসে অনেক। অগো সরকার বহুবার শিলান্যাস করসে। কিসুই হয় নাই। তলে তলে সব এক। শেষমেশ মমতায় আইসা করল। আচ্ছা বলেন তো, এই জিনিসটাই আগে করলে কী ক্ষতিটা হইত। মানুষের ভোট লইয়া বোকা বানাইয়া শুধু শুধু মানুষরে লইয়া হয়রানি। কীসের লইগ্যা অগো বিশ্বাস করুম, কন তো!'

দূরে মানসাই নদীতে তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে। সোনার মতো ঝিকমিক করছে নদী। বহুদিনের প্রতিশ্রুতিকে ছাপিয়ে। অস্ফুটে নদীর কাছে প্রার্থনা করলাম, 'সেতুবন্ধনে সুখ নেমে আসুক সিতাইয়ে। সংসার হোক মানিকবাবুদের। দুধে-ভাতে থাকুন ওঁরা। ভাল থাকুন। বেশি কিছু চায়নি ওরা। শুধু নদীর উপর একটা সেতু চেয়েছিল। সিতাইয়ের সুখের সেতু।'

নদী-ঘেরা কোচবিহারের নির্বাচনে 'নদীভরা ঢেউ' থাকবে না তো কোথায় থাকবে! একটা নদী আপাতদৃষ্টিতে অলস, ছন্নছাড়া, খামখেয়ালি। কিন্তু কোথায় নদী ভাঙবে আর গড়বে, তার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া শুরু

এবারও মানসাই নদীর চরে তরমুজের ফলন ভাল। ভাল দামের আশায় ব্যস্ত মানুষের ভোট নিয়ে ভাবার সময় নেই।

হয় অনেক আগে থেকে। 'কোচবিহারের মানুষ নদীর মতো হয়'— ৪০ বছর আগে গিতালদহ স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, আমার কাকা আমায় বলেছিলেন। আমি কিছুই বুঝিনি। হা হা করে হেসে উঠেছিলেন তৎকালীন প্রধান শিক্ষক (একই স্কুলের), আমার আরেক কাকা অরুণ রায়। সে দিন কিছুই বুঝিনি, কিন্তু এবারের যাত্রায় দেওচরাই পেরিয়ে শীলতোর্সা নদীর উপর সদ্য তৈরি সেতুর উপর দিয়ে বলরামপুর হয়ে দিনহাটার দিকে যেতে যেতে কথাগুলো যেন অন্য মাত্রা নিয়ে এল। সেসব পরে হবে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার গল্পটা বরং আগে বলি।

তাজ্জব তুফানগঞ্জ

এক সময় তুফানগঞ্জ ছিল কোচবিহারে সিপিএম-এর সদর দফতর। তুফানি হাওয়ার অঙ্গুলিহেলনে নির্ধারিত হত কোচবিহারের হাওয়া কোন দিকে বইবে। '৭২-এর পর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল কংগ্রেস। '৭৭-২০০৬ সিপিএম-এর একাধিপত্য মুখ থুবড়ে পড়ে ২০১১-য় মমতা-হাওয়ায়। বাম-জোটের প্রার্থী হেরে যান বাম-জোটেরই সাংসদ-বিধায়ক অমর রায় প্রধানের পুত্র তৃণমূল প্রার্থী অর্ঘ্য রায় প্রধানের কাছে।

তুফানগঞ্জ বাজারে চা খেতে খেতে দেখছি সিপিএম-এর পার্টি অফিস। ঢোকার মুখে বাম-কং জোট প্রার্থী কংগ্রেসের শ্যামল চৌধুরীর বিরাট ফেস্টুন। নিজেকে একটু চিমটি কেটে দেখলাম। ঘুমিয়ে পড়িনি তো? স্বপ্ন দেখছি না তো? না না, দিব্যি জেগে আছি। দু'-দু'বার ক্যামেরা ফোকাস করেও নামিয়ে নিলাম। বুঝতে পারছি না কোথায় ফোকাস করব। হাত-হাতুড়ি-বাঘ-বাঘের মাসি সব এক হয়ে গিয়েছে! বিড়ম্বনায় পড়েছি বুঝতে পেরে চায়ের দোকানে মিন্টু বলে উঠল, 'আস্তে খান। গরম আছে। জিব পুড়ে যাবে।'

'সে পুড়ুক। কিন্তু কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না মিন্টু। ফাজিল করিম জিতব। সে কে?' (হেসে) 'ফজলে করিম মিঞা। রবি ঘোষের কাছের লোক। অর্ঘ্যরে সরাইয়া ফাজিলরে দিসে তুফানগঞ্জ নিজের হাতে রাখব বইলা। তুফানগঞ্জ তো কাসাইয়ের জায়গা।'

'যাঃ বাবা, এ যদি সত্যি হয় তাহলে কি রবি ঘোষ একাই নির্বাচনী মেশিনারি উত্তর-দক্ষিণ কোচবিহার, নাটাবাড়ি, মাথাভাঙা এবং তুফানগঞ্জে প্রয়োগ করতে চাইছেন? কিন্তু এক ঢিলে কি সব পাখি পড়বে? নাকি উলটে নিজেই বিপদের মুখোমুখি লড়ছেন রবি ঘোষ?' বিড়ি ধরিয়ে মিন্টু চাপা স্বরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে, অনেকটা যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে— 'নাটাবাড়ি, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার উত্তর আর সিতাইয়ে কর্তার নিজের লোক। এহন দেহেন কী হয়! কর্তার এখন মাথা গরম ঘন ঘন। চাপে আছে মনে হয়!'

পার্টি অফিসে ঢুকতেই সিপিএম জেলা নেতা সুভাষচন্দ্র ভাওয়ালের হাসিমুখ আর সঙ্গে লাল চা। উত্তর দিচ্ছেন হাসিমুখে, তবে প্রশ্ন শুনে মাঝেমধ্যে চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন- জিতবেন এবার?

কংগ্রেস পার্টি অফিস। চেয়ারে বসে আছেন দীর্ঘ দিনের পোড়খাওয়া কংগ্রেসি নেতা তুফানগঞ্জের জোটপ্রার্থী শ্যামল চৌধুরী। তাঁকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকার নবীন-প্রবীণ ফব ও কংগ্রেসি কর্মীরা। শ্যামলবাবুর ঠিক পিছনেই রাজীব গান্ধি, ইন্দিরা গান্ধি এবং জওহরলাল নেহরু। সবাই হাসছেন। ছবিতে। মহাত্মা গান্ধি এবং সুভাষচন্দ্র বসু নেই অবশ্য।

মাত্র ১.৮৯ শতাংশ কংগ্রেসি ভোট, তবু বামেদের ঘাড়ে চেপে জয়ের আশা দেখছেন তুফানগঞ্জের জোট প্রার্থী জেলার পুরনো কংগ্রেস নেতা শ্যামল চৌধুরী।

সুভাষচন্দ্র- কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত বেরিয়ে যাব (সাংঘাতিক বিষয়, আর একটু হলে মুখের ভিতর লাল চা পুরোটাই বেরিয়ে যেত)।

প্রশ্ন- হারলেন কেন ২০১১-তে?

সুভাষচন্দ্র- ভুল করেছিলাম। শুধরে নিয়েছি। (কীভাবে? জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। করলেই নির্ঘাত বলতেন, 'পার্টি সিক্রেট')।

প্রশ্ন- কংগ্রেসের প্রার্থী নিয়ে জিততে পারবেন তো?

সুভাষচন্দ্র- এটা মানুষের জোট। তা ছাড়া পার্টির সিদ্ধান্ত এটা। যদিও কংগ্রেসের মাত্র ১.৮৯ শতাংশ ভোট। (কৌশলে শুনিয়ে দিলেন। বামেদের ঘাড়ে চেপেছে কংগ্রেস প্রার্থী। তাঁরাই পার করবেন বৈতরণি)।

প্রশ্ন- কংগ্রেসের সঙ্গে কেরলে কুস্তি আর রাজ্যে দোস্তি?

সুভাষচন্দ্র- পলিটিক্সটা অঙ্ক নয়। কেমিস্ট্রি। (এতদিন শুনেছি ভাব-ভালবাসার সম্পর্কে কেমিস্ট্রি থাকে। এখন রাজনীতিতেও!)

প্রশ্ন- তাহলে জিতবেন বলছেন? নিশ্চিত? ইস্যু কী?

সুভাষচন্দ্র- স্থানীয় নয়। রাজ্যের ইস্যু নিয়ে বলছি। (একটু থেমে) ১০০ মিটারের দৌড়ে নামিনি। ৫,০০০ মিটারের দৌড়ে নেমেছি।

নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। ৫০০০ মিটার দৌড়? সিপিএম-এর একার পক্ষে সম্ভব? তাহলে কি এবার আসলে জেতার আশা নেই? ভোটের পর জোট ভেঙে গেলে ৫,০০০ মিটার কীভাবে দৌড়াবেন? নাকি অস্তিত্বসংকটে কং-সিপিএম এখন ভাই-ভাইয়ের 'কেমিস্ট্রি'? জানিনে বাপু। এ বড় জটিল 'অঙ্ক'। মাফ করবেন 'কেমিস্ট্রি'।

কংগ্রেস পার্টি অফিস। চেয়ারে বসে আছেন দীর্ঘ দিনের পোড়খাওয়া কংগ্রেসি নেতা তুফানগঞ্জের জোটপ্রার্থী শ্যামল চৌধুরী। তাঁকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকার নবীন-প্রবীণ ফব ও কংগ্রেসি কর্মীরা। শ্যামলবাবুর ঠিক পিছনেই রাজীব গান্ধি, ইন্দিরা গান্ধি এবং জওহরলাল নেহরু। সবাই হাসছেন। ছবিতে। মহাত্মা গান্ধি এবং সুভাষচন্দ্র বসু নেই অবশ্য।

অফিসে ঢুকে বসতে না বসতেই কথা বলার ঢঙে শ্যামলবাবু বলতে শুরু করলেন। খুব ভাল বলেন। অনবরত বলে যাচ্ছেন অনায়াস ভঙ্গিমায়। কোথাও আটকাচ্ছেন না। এবং আরও অদ্ভুত, ফব নেতারা চুপ করে শুনছেন। কিছু বলছেন না। এও সম্ভব!

প্রশ্ন- জিতবেন আপনি?

শ্যামল- (একটু থামলেন এবং শান্ত গলায় হাসতে হাসতে জবাব দিলেন) হারলেও ক্ষতি নেই। অভাবনীয় সমর্থন পাচ্ছি, যেখানেই যাচ্ছি। আর হারব না জিতব (বামপন্থী নেতাদের লক্ষ্য করে), সেটা ওঁরাই জানেন।

প্রশ্ন- সিপিএম-এর অত্যাচার কি কংগ্রেস...

শ্যামল- (কথা শেষ না হতেই) তৃণমূল আমলে যে অত্যাচার হয়েছে, সেটা সিপিএম-এর বাপ (সিপিএম-এর শরিক ফব নেতারা তখন বসে আছেন ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে)।

প্রশ্ন- তাহলে জিতবেন বলছেন? কোনও টক্কর নেই? রবি ঘোষ, ফজলে করিম কি ছেড়ে দেবেন?

শ্যামল- আমি কারও বিরুদ্ধে বলতে চাই না। তবে আমি কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছি না। (চাপা স্বরে) ওরা আগে নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দল ঠিক করুক! তৃণমূল প্রার্থী নিয়ে এখানে বিক্ষোভ আছে। তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগও রাখছে। ২৩,০০০ ভোটে লিড নিয়ে জিতব। (এর পর টেবিল ঠুকে) শুনে রাখুন, বেশ কিছু বুথে তৃণমূল এজেন্ট দিতে পারবে না। তৃণমূলের আন্দাজ ছিল না, বাম-কংগ্রেস জোট কত শক্তিশালী হতে পারে।

মিটিং-এর তাড়া থাকায় এর পর বিদায় নিলেন শ্যামলবাবু। বাইরে দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামছি। বোঝার চেষ্টা করছি পুরো ব্যাপারটা। ততক্ষণে উলটো দিকে এক তরমুজওয়ালার অজান্তে তার তরমুজ চিবিয়ে দিব্যি মুখ চাটতে চাটতে চলে গেল একটা গোবেচারা গোরু। গণশক্তি স্ট্যান্ড-এর দিকে নিচেই তরমুজ বিক্রি হচ্ছে। ওঁকে সাবধান করার আগেই একটা টোটো গাড়ি প্রায় আমার ঘাড়ে উঠে পড়ছিল— সরে আসতেই দেখি টোটোর পিছনে ফজলে করিম মিঞার হাসিমুখ। পোস্টার। গরমে মাথা তখন ভোঁ ভোঁ করছে। তুফানি মায়ায় আমি কি পথ হারাইয়াছি? আমি ভুল বকছি কেন? আমার কি রবির দশায় পেল! না, এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। কিছু একটা ভুতুড়ে কেমিস্ট্রি আছে!

ফিরে গেলাম কোচবিহার টাউনে। বিকেলে বেরলাম রবিবাবুর সন্ধানে। দেখা করার বড় ইচ্ছে। কিন্তু শহর ঘুরে এক অদ্ভুত কথা শুনলাম। দুঁদে সংগঠক রবিবাবু নাকি এখন গোষ্ঠীকোন্দল রোগে আক্রান্ত। নিজের জেলায় নিজের দলেই তিনি বাছবিচার করছেন। মাঝেমধ্যেই নাকি মেজাজ হারিয়ে ফেলছেন এবং কোচবিহার জেলায় সব ক'টি কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকোন্দল। ঠিক করলাম, এ নিয়ে রবিবাবুকেই বরং সরাসরি জিজ্ঞেস করা যাবে। কিন্তু সন্ধে থেকে রাতে তিনবার ফোন ও দু'বার এসএমএস করেও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

রবীন্দ্রনাথ সমীপে

অবশেষে সকালবেলা স্থানীয় সাংবাদিক পিনাকীর চেষ্টায় পাওয়া গেল সাক্ষাতের সুযোগ। একটি ছোট অঞ্চল সভায় তিনি তখন বসে আছেন। গাড়ি থেকে নেমে কাছে যেতেই নিজের পাশে বসালেন। 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকা দিলাম ওঁর হাতে। উলটেপালটে পিনাকীকে হেসে বললেন, 'তোমরা কিন্তু আমার ছবি ছাপাচ্ছ না। শুধু সৌরভের ছবি দিচ্ছ।' 'বাঃ, বেশ মজা করতে পারেন আপনি।' শুনে স্মিত হেসে সহযোগিতা করলেন ছবি তুলতে। তৃণমূলের খারাপ সময়ের লড়াকু নেতা-সংগঠকের ছবি তোলা শেষ হতেই সরাসরি প্রশ্নে ঢুকে গেলাম।

প্রশ্ন- জিতবেন?

রবি- তিরিশ হাজারের বেশি ভোটে জিতব।

প্রশ্ন- গোষ্ঠীকোন্দল?

রবি- ওইসব সমস্যা আমার কেন্দ্রে নেই। তবে ক্ষোভ-বিক্ষোভ আছে। স্বার্থে ঘা পড়লে হবেই। নির্বাচনের অঙ্গ।

এর পর দীর্ঘ সময় ধরে সরকারি কর্মসূচি নিয়ে একনাগাড়ে ভাষণ দিতে লাগলেন।

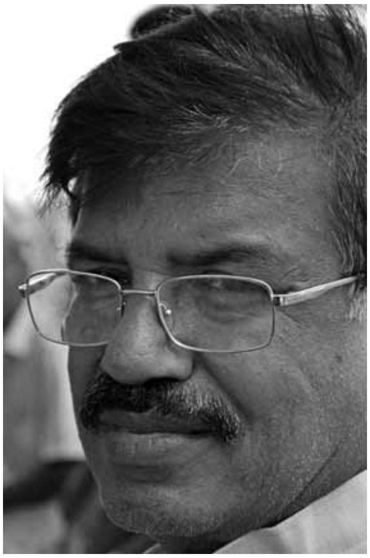

বিরোধীদের তো বটেই, নিজের দলের নানা মহল থেকেও অজস্র অভিযোগ, তবু কোচবিহারের ৯টি কেন্দ্রেই জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রশ্ন- আপনি তো মমতা ব্যানার্জিকে কথা দিয়েছেন, কোচবিহারে ৯টি সিটেই প্রার্থীদের জেতাবেন। জিতবে কি? আপনি তো যাচ্ছেন না সব জায়গায়। কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রেও আপনাকে খুঁজে পাইনি।

রবি- না না, এরকমটা সত্যি নয়। ৭টায় গিয়েছি। ২টোয় সভার দিন ঠিক করবে বলেছে। ৯টাতেই জিতব আমরা। রেকর্ড মার্জিনে জিততে চাইছি।

প্রশ্ন- মিহির গোস্বামীও জিতবেন তাহলে? আপনার সহযোগিতা ছাড়াই?

রবি- উনি একজন অভিজ্ঞ নেতা। এতবার ভোটে দাঁড়িয়েছেন। উনি গোটাটাই জানেন। আমার সহযোগিতা নিশ্চয়ই থাকবে। তবে কি জানেন, সবাই ভোট দেবে মমতা ব্যানার্জিকেই। ৯টি কেন্দ্রেই মমতা জিতবেন।

প্রশ্ন ছিল বহু। কিন্তু ওঁর ভাষণ দেবার সময় হয়ে গিয়েছে। আর আমায় যেতে হবে মাথাভাঙায়। এক অদ্ভুত মানুষের সন্ধানে। তৃণমূল পঞ্চায়েতপ্রধান। যিনি মনে করেন, সংগঠন করার জন্য বাজার থেকে পয়সা তোলার দরকার নেই। আমার গাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে তাহলে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল নেই?' হাসতে হাসতে সঞ্জয় বর্মনের উত্তর, 'সাংঘাতিক আছে। এমনকি রবি ঘোষের বিরুদ্ধেও গোষ্ঠী আছে।' 'কিন্তু কেন বলো তো এই মানুষটাকে নিয়ে এত কথা উঠছে? উনি তো অনেক কাজও করেছেন। এক সময়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকা সংগঠক!' 'আসল কথা কী দাদা, মাথা ঘুরে গিয়েছে টাকায়। অনেক কাজও করেছেন, আবার অনেক টাকাও কামিয়েছেন। ভাগবাটরাও আসে। এখন উনি কাছের লোকেদের বিভিন্ন বিধানসভায় বসাইয়া নিজের ক্ষমতা ধরে রাখতে চান।' 'ও, এই ব্যাপার! তাহলে উদয়ন...' মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সঞ্জয় বলল, 'দ্যাখেন দাদা, আগে ফব করতাম, এখন তৃণমূল। ভিতরের খবর হইল, উদয়ন বা মিহির গোস্বামীর মতো লোকজনদের উপর রবিদার বিষনজর। ওদের মতো লোকজন উপরে উঠলে রবিদার ক্ষতি।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে হা হা করে হেসে উঠল সঞ্জয়।

এ যেন মহাভারতের সঞ্জয়। যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ সহজ-সরল ভাষায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করে দিচ্ছে। এখন অনেক সঞ্জয়দের দরকার আমাদের দেশের রাজনীতিতে, যারা কুমন্ত্রণা বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা না বলে, লোভলিপ্সা, অহংকারে অন্ধ নেতা-মন্ত্রীদের চোখ খুলে দেবে সত্যভাষণে। একটি রাজ্যে পরিবর্তন এনে দিল মানুষ, কিন্তু কিছু নেতা-মন্ত্রী অভ্যেস পরিবর্তন করতে পারলেন না। দুর্ভাগ্য আমাদের।

কোচবিহারের উজ্জ্বল আবিষ্কার

গরম আর গোষ্ঠীকোন্দলের কথা শুনতে শুনতে যখন ক্লান্ত-অবসন্ন, তখন প্রথম বৃষ্টির পর এক ঝলক ভেজা গন্ধের মতো সামনে এল দু'টি চরিত্র। একজন উদয় সরকার। পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতপ্রধান। অন্যজন মিহির গোস্বামী। দক্ষিণ কোচবিহার কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী। দু'জনেই প্রাক্তন কংগ্রেসি। গোড়া থেকেই তৃণমূলে। উদয়বাবু মমতার মুখোমুখি হননি। মিহিরবাবু এক থালায় রুটি-তরকারি খেয়েছেন মমতার সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী হবার অনেক আগের কথা সেসব।

সম্ভবত পচাগড় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পঞ্চায়েত, যেখানে আধিকারিকদের নিজের পয়সা খরচ করে আসতে হয়। এ পঞ্চায়েতে ঘুষ নেওয়া বারণ। নিলে আর রক্ষে নেই। মুখোমুখি হতে হবে উদয়ের। এমনিতে সদাহাস্যময় মানুষটি কঠিন, ক্ষমাহীন ঘুষখোরদের কাছে। তিনি ঘুষ খানও না, দেনও না। বিধায়ক বিনয়কৃষ্ণ বর্মন এবং জেলা সভাপতি রবি ঘোষ দু'জনেই ভরসা করেন উদয়কে। ওঁর বাড়ির সামনের রাস্তা এখনও পাকা নয়। স্ট্রিট ল্যাম্পও নেই। সারাদিন সংগঠন এবং পঞ্চায়েত নিয়ে পড়ে আছেন এবং দৃঢ় বিশ্বাস, সংগঠন চালানোর জন্য পয়সার দরকার নেই। পয়সা ছড়িয়ে ফাঁকিবাজির রাজনীতি করেন না।

অন্য দিকে, মিহির গোস্বামী। প্রখর স্মৃতিশক্তি, বাগ্মী। অনর্গল কথা বলে যেতে

দেওচড়াইতে শীলতোর্সা নদীর উপর নতুন ব্রিজ— জেলায় সড়ক যোগাযোগের নতুন যুগের সূচনা করেছে।

সামনে নাকি মিছিল যাচ্ছে। আস্তে আস্তে বাস, ট্রাক, ছোট গাড়ির লাইন। মানুষের বিরক্তি বাড়ছে। বিরাট মিছিল। যদিও সেই মিছিলে ৮/১০ বছরের ছোট বাচ্চাকেও দেখেছি, আইসক্রিম খেতে খেতে যাচ্ছে। কয়েকটা কথা তখন নদীর জলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে— 'গোষ্ঠীকোন্দল এখানে সাংঘাতিক।' 'সংগঠন করার জন্য পয়সা তোলার দরকার নেই।' 'তৃণমূল এজেন্ট দিতে পারবে না বেশ কিছু জায়গায়।' 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন রাজনীতিজীবীদের সংখ্যা বেশি।' 'রাজনীতি কোনও অঙ্ক নয়। কেমিস্ট্রি।'

পারেন ব্যারিটোন ভয়েসে। বেগতিক প্রশ্ন করলে রেগে যান না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেন না। পলিটিক্যালি হ্যান্ডেল করেন। রামায়ণ থেকে কবীর, কোরান, কথামৃতে অনায়াস যাতায়াত। অন্য কেউ কথা বললে মন দিয়ে শোনেন। এ জন্যেই এত ভাল বক্তা উনি। প্রবল সেন্স অব হিউমার এবং হাসতে জানেন প্রাণ খুলে। গোমড়া মুখের সিরিয়াস টাইপের টিপিক্যাল নেতা নন। নির্বাচনী ময়দান ওঁর অচেনা নয়। সিতাই থেকে তুফানগঞ্জ, নাটাবাড়ি থেকে মাথাভাঙা যেখানেই গিয়েছি, সব দলের নেতা-কর্মীদের কাছে শুনেছি, কোচবিহারের ৯টি কেন্দ্রে সব প্রার্থীর মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য মিহির গোস্বামী। এমনকি খোদ সিপিএম ভোটাররা বলেছেন, 'উনি যে কেন্দ্রে যখন দাঁড়াবেন, সবাই ওঁকে ভোট দেবে।' এটা মানুষের ভালবাসার জোর। টাকা ছড়িয়ে এই ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। এটা 'রাজার মতো মহান যে নীতি', সেই রাজনীতির জোর। পশ্চিমবঙ্গে এখনও মানুষ তাদের নেতাকে দালাল বা ব্যবসায়ী মনে করে না। তারা রাজনৈতিক নেতার মধ্যে দেখতে চায় নীতির জোর। কিন্তু পলিটিক্যাল কমিউনিটি কী চায়? প্রশ্ন ছিল মিহিরবাবুর কাছে। তাড়াহুড়ো না করে ভাবছেন আর বলছেন, 'দু'ধরনের লোক রাজনীতিতে দেখা যায়। রাজনীতিজীবী আর রাজনীতিসেবী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সময়ের রাজনীতিতে রাজনীতিজীবীদের সংখ্যাটা বেশি।' 'এই ইলেকশনে কোচবিহারের ব্যবসায়ী মহল থেকে কত তুলেছেন?' 'ওরা দিতে এসেছিল। কত লাগবে জানতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি বলেছি, লাগবে না, প্রয়োজন হলে চেয়ে নেব। আসলে সভাসমিতি করতে আমার কোনও খরচ নাই। যারা আমার সভাসমিতিতে আসে, তাদের আমি জলপানি দিই না। আমি নির্বাচনে নামার আগেই বলে দিয়েছি, কোনও গোষ্ঠী আমি করব না এবং আমার সভাসমিতিতে এলে পকেট ভরাতে পারব না।'

'কিন্তু আপনার এলাকায় গোষ্ঠী তো আছে। নির্বাচনে তার প্রভাবও পড়তে পারে।' 'হ্যাঁ আছে। কিন্তু ৮০ শতাংশ বিতণ্ডা আমি মেটাতে পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস।' কথাটা যে ভুল বলেননি, সেটা প্রমাণিত। তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার দিন রাস্তায় যে মিছিল, তার মাথা দেখা গেলেও লেজের সন্ধান পাওয়া ছিল দুষ্কর। নির্বাচনী প্রচার শুরুর আগে তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'আমি জিতলে আমার কেন্দ্রের কোনও সরকারি বরাতের ১ শতাংশও আমি নেব না।' অনেকেই ভেবেছিলেন, এতে হিতে বিপরীত হবে না তো! কিছু না নিয়ে কি রাজনীতি হয়! কিন্তু কোচবিহারের মানুষ ও তৃণমূল কর্মীরা দেখিয়ে দিয়েছে, তারা স্রোতের বিপরীতে নীতির জোরে চলতে জানে।

উদয়বাবু-মিহিরবাবুর মতো মানুষকে যদি পশ্চিমবঙ্গ সামনে থেকে না পায়, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। রাজনৈতিক শিল্প ও গণতন্ত্রের জন্য এই মানুষগুলোকে বড় প্রয়োজন। দলমত নির্বিশেষে তাঁরা মানুষের নেতা। এঁদের কাছেই তো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিখবে রাজনীতির মানে। এবং এঁদের মতো মানুষও যদি বিপথগামী হন, আমরা এঁদের নিয়েও সমালোচনা করব 'এখন ডুয়ার্স'-এ।

ফিরে আসছি ধূপগুড়ি হয়ে। হঠাৎ বাস দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে নাকি তৃণমূলের মিছিল যাচ্ছে। আস্তে আস্তে বাস, ট্রাক, ছোট গাড়ির লাইন। মানুষের বিরক্তি বাড়ছে। বিরাট মিছিল। যদিও সেই মিছিলে ৮/১০ বছরের ছোট বাচ্চাকেও দেখেছি, আইসক্রিম খেতে খেতে যাচ্ছে। কয়েকটা কথা তখন নদীর জলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে— 'গোষ্ঠীকোন্দল এখানে সাংঘাতিক।' 'সংগঠন করার জন্য পয়সা তোলার দরকার নেই।' 'তৃণমূল এজেন্ট দিতে পারবে না বেশ কিছু জায়গায়।' 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন রাজনীতিজীবীদের সংখ্যা বেশি।' 'রাজনীতি কোনও অঙ্ক নয়। কেমিস্ট্রি।' এই কথাটা মনে পড়তেই আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। মুখে রুমাল চাপা দিলাম হাসি চাপতে। রাস্তার জ্যাম ছেড়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের কনডাক্টর সবাইকে গুনে গুনে বাসে তুলে বাস ছেড়ে দিল।

নির্বাচন শেষে আবার আসব কোচবিহারে। গল্প শুনতে। জীবন-নদীর গল্প। নদীর সঙ্গে বহু দিনের সেই ঘাটের গল্প।

ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল
নদীর সঙ্গে গল্প করে ঘাটের জল
ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল।

ছবিঃ জয়ন্ত গুহ

সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা কেন্দ্র মেখলিগঞ্জে মানুষ তাকিয়ে আছে তিস্তা সেতুর দিকে

ভোট আসে, ভোট যায় নিয়ম মেনেই। কিন্তু সমস্যা মেটে না কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ বিধানসভার এলাকাবাসীদের। এই এলাকায় অন্যতম প্রধান সমস্যা যোগাযোগের। আর সেই কারণেই এই বিধানসভা কেন্দ্রটি জেলার মধ্যে সব থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এলাকাবাসীর সবচেয়ে বড় ক্ষোভ তিস্তা নদীতে কোনও পাকা সেতু না থাকা। অথচ ওই সেতুর গুরুত্ব যে অপরিসীম, সে কথা জানেন এলাকার সব রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাই। লোকসভা থেকে বিধানসভা, এমনকি প্রতিটি পঞ্চায়েত ভোটের আগেও তিস্তায় সেতু গড়ার দাবিকে ভোট প্রচারের ইস্যু করে থাকেন তাঁরা। এবারও ওই সেতুকে হাতিয়ার করে নির্বাচনী প্রচার করছে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই। তবে তাদের কথায়, এবার আর তেমনভাবে কান দিতে চাইছে না এলাকার অধিকাংশ মানুষই। এবার তাদের বক্তব্য একেবারেই ভিন্ন। দীর্ঘদিন ধরে তিস্তার উপর সেতু নিয়ে তাঁরা বহু প্রতিশ্রুতি শুনে এসেছেন, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। নিত্যযাত্রীদের নদী পেরিয়ে যাতায়াতে কী পরিমাণ নাজেহাল হতে হয়, সে কথা তারা বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েছে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই এখনও পর্যন্ত মেলেনি। রোজকার সমস্যায় নাকাল মানুষের ক্ষোভ আজ ব্যাপক আকার নিয়েছে। ভোটের মুখে তাই মেখলিগঞ্জ এলাকাবাসীর সাফ কথা, 'প্রতিশ্রুতি নয়, আমরা তিস্তা নদীতে সেতু চাই।'

প্রসঙ্গত বলা দরকার, মেখলিগঞ্জ মহকুমায় মোট দু'টি ব্লক। একটি মেখলিগঞ্জ এবং অপরটি হলদিবাড়ি ব্লক। মেখলিগঞ্জ ব্লকে রয়েছে আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হলদিবাড়িতে ছ'টি। দু'টি এলাকা মিলিয়ে ভোটার দুই লক্ষেরও বেশি। দুই ব্লকের মধ্যে সরাসরি দূরত্ব মাত্র ৮ কিলোমিটার, কিন্তু মাঝখানে তিস্তা নদী এই ব্লক দু'টিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তিস্তা নদীতে কোনও সেতু না থাকায় এই দুই ব্লকের মানুষকে জলপাইগুড়ি শহর হয়ে প্রায় ৮০ কিলোমিটার ঘুরপথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। যেহেতু মেখলিগঞ্জ মহকুমা শহর, তাই মহকুমার প্রায় সব সরকারি দপ্তর এবং আদালত সদর ব্লক মেখলিগঞ্জ শহরেই অবস্থিত। প্রতিদিন নানা কাজে হলদিবাড়ি ব্লকের মানুষকে মেখলিগঞ্জে আসতেই হয়। এতে যে শুধু তাদের প্রচুর সময় নষ্ট হচ্ছে তা-ই নয়, অর্থেরও অপচয় হচ্ছে। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দূর করতে তিস্তা নদীতে একটি স্থায়ী পাকা সেতু গড়া খুবই প্রয়োজন। গোটা মেখলিগঞ্জ মহকুমাবাসী সেই দাবি জানিয়ে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে। শুধু তা-ই নয়, বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়েছে একাধিকবার। সম্প্রতি হলদিবাড়িতে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা সেতুর 'জয়ী' নামকরণ করে এর শিলান্যাসও করে গিয়েছেন। কিন্তু সে কাজও শুরু হয়নি এখনও। মেখলিগঞ্জবাসীদের মধ্যে হতাশা যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

মেখলিগঞ্জ এলাকার একাংশ মানুষ বলেন, রাজ্যের ১ নং বিধানসভা কেন্দ্র হলেও নানা দিক দিয়েই তা পিছিয়ে রয়েছে। এই মহকুমার একটি বিরাট অংশ রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষে। সেখানে নেই তেমন কোনও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা। ওই এলাকার বেশির ভাগ মানুষই কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাহলেও কৃষিকাজে তেমন লাভ হয় না। ফলে এখানকার অনেক মানুষই কাজের খোঁজে বাইরে থাকেন। সেতু না থাকায় ক্ষুব্ধ এলাকার কৃষিজীবী মানুষরাও। তাঁরা জানালেন, মেখলিগঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়িতে একটি বড় সবজিবাজার রয়েছে। সেই বাজারটি উত্তরবঙ্গের একটি বড় সবজিবাজার হিসেবে পরিচিত। সেই বাজারে কৃষিপণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রতিদিনই বাইরে থেকে অনেক মহাজন আসেন। এখানকার কৃষিপণ্য ভিন রাজ্যেও পাড়ি দেয়। কিন্তু তিস্তা নদীতে সেতু না থাকায় মেখলিগঞ্জ ব্লকের চাষিরা হলদিবাড়ির সবজিবাজারে কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে পারেন না। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা ফসলের ভাল দাম পান না। ওই বাজার ছাড়া মেখলিগঞ্জ ব্লকে কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য তেমন কোনও বড় বাজারও নেই। আর জলপাইগুড়ি শহর হয়ে হলদিবাড়ি বাজারে কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য নিয়েও যেতে চান না অধিকাংশ কৃষক। কারণ, সে ক্ষেত্রে যে

পরিমাণ পরিবহণ খরচ পড়ে তা বহন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে চাষাবাদের খরচখরচা বাঁচিয়ে লাভের মুখ আর দেখা হয় না কৃষকের। অনেক সময় মহাজনের টাকা মেটানো দায় হয়ে যায়। এমনকি লাভ না হবার আশঙ্কাও থাকে বলে চাষিরা জানিয়েছেন। একই সমস্যার মধ্যে পড়ে রয়েছেন হলদিবাড়ি ব্লকের মানুষজন। হলদিবাড়ি-মেখলিগঞ্জের মধ্যে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সেটিও তথৈবচ। সরাসরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনও বাস চলাচল করে না। অন্যান্য পরিবহণও নেই বলা ভাল। ফলে চরম ভোগান্তির মধ্যেই রয়েছেন হলদিবাড়ি এলাকার মানুষ। তাই তিস্তা নদীর উপর সেতু চাইছেন সকলেই। সেতু না হওয়ায় দু'টি ব্লকের বাসিন্দারা কোনও রাজনৈতিক দলের উপরই এখনও আর ভরসা রাখতে পারছেন না। তাঁরা বহুকাল বহু প্রতিশ্রুতি শুনেছেন। এবার অন্তত শিলান্যাস হওয়া সেতুর কাজ দ্রুত সম্পন্ন হোক— এখন এটাই দেখতে চাইছেন তাঁরা।

কৃষিপ্রধান এলাকা হওয়া সত্ত্বেও কৃষির উপর নির্ভরশীল এই এলাকার অধিকাংশ মানুষই রয়েছেন সব থেকে পিছিয়ে। একদিকে তিস্তায় সেতু না থাকা, অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় কৃষিপণ্যের দাম পান না কৃষক। অন্য দিকে মেখলিগঞ্জে আজ অবধি গড়ে ওঠেনি একটিও হিমঘর, যা চাষিদের সমস্যা বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। এলাকায় অন্তত একটি হিমঘর তৈরির জন্য দিনের পর দিন দরবার করে আসছেন, কিন্তু কেউই তাঁদের আবেদনে কর্ণপাত করেননি। এলাকার চাষিরা জানালেন, মাঝেমধ্যেই দেখা যায় কৃষিপণ্যের দাম অনেকটা কমে গিয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে সাধারণত কৃষকরা কৃষিপণ্য হিমঘরেই মজুত রাখেন। তারপর বাজারদর বৃদ্ধি পেলে সেগুলি বিক্রি করতে পারেন। তাতে কৃষিপণ্য এবং দাম উভয়েরই ক্ষতির সম্ভাবনা ততটা থাকে না। কিন্তু হিমঘর না থাকাতে চাষিরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মোট কথা, এই এলাকার কৃষকদের ফসলের সঠিক দাম পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ হিমঘর প্রতি বছরই ভোট প্রচারের একটি অন্যতম ইস্যু। এবারও অন্যথা হয়নি। অন্যান্যবারের মতো প্রতিশ্রুতিও মিলছে। কিন্তু আজ অবধি হিমঘর তৈরি হয়নি। ভোট মিটে গেলে এবারও যে কৃষকরা হিমঘর পাবেন, তার নিশ্চয়তা দেবেন কে? ফসল মজুতের জন্য এখানকার কৃষকদের বহু দূরে ছুটতে হয়। তাতে খরচও বেশি হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও শেষ পর্যন্ত পণ্য মজুত করার সুযোগই পাওয়া যায় না। দীর্ঘকালের এই বঞ্চনা আজ মেখলিগঞ্জের চাষিদের মনে তীব্র অসন্তোষ তৈরি করেছে।

সমস্যা রয়েছে পানীয় জল পরিষেবা এবং সেচব্যবস্থার ক্ষেত্রেও। মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি মহকুমায় মোট ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। কিন্তু সর্বত্র জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছায়নি এখনও। নেই সরকারি তরফে সেচের ব্যবস্থাও। অপর্যাপ্ত সেচের কারণে চাষাবাদ ভীষণভাবে মার খাচ্ছে বলেও অভিযোগ। এখানকার অধিকাংশ চাষির আর্থিক অবস্থা যে মোটেও ভালো নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সকলের পক্ষে বাইরে থেকে পাম্পসেট ভাড়া করে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। চাষিরা জানিয়েছেন, সরকারের তরফে যে ক'টি পাম্পসেট ছিল, প্রশাসনিক উদাসীনতায় ইতিমধ্যে অনেকগুলি নদী সেচ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি বর্তমানে উধাও। অথচ এই এলাকার মানুষরা কৃষিকর্মের উপরেই নির্ভরশীল।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় বহু জায়গার মানুষ এখনও পাতকুয়ো কিংবা টিউবওয়েলের জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রায়শই সেইসব এলাকার মানুষদের পেটের নানাবিধ রোগ দেখা দেয়। বিশেষ করে শুখা মরশুমে এখানে দেখা দেয় তীব্র জলসংকট। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাই যেখানে নেই, সেখানে বছরের একটা বড় সময় যদি জলেরই দেখা না মেলে তাহলে সেখানকার মানুষদের পরিস্থিতি কতটা করুণ হতে পারে? সরকারের তরফে কিছুই কি করা হয়নি? সাম্প্রতিককালে ভোটবাড়ি, বাগডোগরা-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই উদ্যোগগুলিতে পরিষেবা চালুর জন্য যত না সক্রিয়তা, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ততা তড়িঘড়ি উদ্‌বোধনের। এমনটাই অভিযোগ অধিকাংশ গ্রামবাসীর। অধিকাংশ এলাকার পথঘাট নিয়েও মানুষ বিস্তর অভিযোগ জানালেন। বহু গ্রামে এমন অনেক রাস্তা আছে, যেগুলি সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে গিয়েছে। বছরের একটা সময় তবু সে রাস্তায় কোনওক্রমে চলাফেরা করা যায়, কিন্তু বর্ষায় সেগুলি শুধু জল-কাদায় আটকে থাকে। এই অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থার কারণেই আর্থিক দিক দিয়ে এই মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি ব্লকের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চল পিছিয়ে রয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন।

এতসব সমস্যায় জেরবার হওয়া মানুষজনের ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে সীমান্ত সমস্যা। ভারত-বাংলাদেশ সীমানা-ঘেঁষা হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জ এলাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া, কিন্তু নিরাপত্তার বদলে ওই বেড়া স্থানীয় বহু মানুষের সমস্যা বাড়িয়েছে কয়েক গুণ। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক ১৫০ মিটারের নিয়ম মেনেই, কিন্তু ভারতে বসবাসকারী অনেক মানুষের জায়গাজমি পড়েছে কাঁটাতারের বেড়ার ভিতরে। এইভাবে বেড়াবন্দি হয়ে গিয়েছে কলসিগ্রাম, হাড়িকামাত, গোলাপাড়া, লোথামারির মতো আরও অনেক গ্রাম ও সেখানকার বাসিন্দা। নিয়মের শাসন মেনেই বেড়ার নির্দিষ্ট গেট দিয়ে বাসিন্দাদের নিজের গ্রামে প্রবেশ করতে হয়, একইভাবে বাইরে যেতেও হয় সেই নিয়মানুসারে। শুধু তা-ই নয়, গেট খোলা বা বন্ধেরও রয়েছে নির্দিষ্ট সময় ও নিয়মকানুন। সবসময়ই সঙ্গে রাখতে হয় পরিচয়পত্র। কারণ, সেটি রক্ষীরা চাইলেই দেখাতে হয়। ইচ্ছে হলেই যখন-তখন গ্রামে যাতায়াত সম্ভব হয় না। তার উপর একটু এদিক-ওদিক হলেই রয়েছে প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানদের চোখরাঙানি। তাই বেড়াবন্দি ওইসব গ্রামের মানুষরা নিজেদেরকে খাঁচাবন্দি পাখির মতোই মনে করেন।

কাঁটাতারের বেড়ার ভিতরে যে তাঁদের ভীষণ সমস্যার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে, সে কথা নতুন নয়। সমস্যা আরও রয়েছে, বেড়ার ওপারে চাষের কাজ করতে যাওয়াটা নিত্য বিড়ম্বনা। তার উপর রয়েছে বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে ফসল চুরিসহ ওই দেশের গবাদি পশুর অবাধ বিচরণে ফসল নষ্টের অভিযোগও। এ ছাড়া বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি ও ঝামেলা তো বেধেই আছে। তাই তাঁরা চাইছেন কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁস থেকে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হোক। এ বিষয়ে মাঝেমধ্যেই তাঁরা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। আবেদন-নিবেদনও করেছেন বহুবার। সীমান্তবাসীদের এইসব যন্ত্রণার কথা আজ আর অজানা নয় রাজনৈতিক দল অথবা প্রশাসন কারওই। কিন্তু কিছু করা তো অনেক দূরের ব্যাপার, ভাবারও সময় হয়নি। অথচ প্রতিটি নির্বাচনের আগেই তাঁরা গ্রামে গিয়ে সীমান্তবাসীদের সমস্যাগুলি মন দিয়ে শোনেন, প্রতিশ্রুতি দিতেও কোনও কার্পণ্য করেন না। কিন্তু সীমান্তবর্তী জেলার এক নম্বর বিধানসভা কেন্দ্র মেখলিগঞ্জ, বিশেষত তার দু'টি ব্লক হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জের মানুষের দাবি, তিস্তা নদীর উপর সেতু, পরিশুদ্ধ পানীয় জল এবং পাকা রাস্তা।

বিশেষ প্রতিনিধি

মন মাতানো মন্দারমণি মন্দারমণির সূর্য-ধোওয়া বালুচরে সমুদ্রের স্রোত যখন আছড়ে পড়ে, সমস্ত মনখারাপ যেন তার সঙ্গে ভেসে চলে যায়। জিভে জল আনা সামুদ্রিক মাছ দিয়ে মহাভোজ সারতে সারতে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মানুষ ভুলে যায় চাওয়া-পাওয়ার সব হিসেব। আর সূর্য ডোবার পালা এলে, মন্দারমণি জেগে ওঠে অন্ধকারে। তখন কান পাতলে শুধু সমুদ্রের শব্দ শোনা যায়।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb www.twitter.com/TourismBengal (033) 2243 6440, 2248 8271

বহু স্বপ্নের প্রতিনিধি সাবেক ছিটের ভোটাররা

সকাল থেকে প্রতীক্ষা। নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তর থেকে সরকারি বাবুরা আসবেন। ক্যাম্পের প্রাপ্তবয়স্কদের হাতে তুলে দেবেন সচিত্র পরিচয়পত্র। সেটা দিয়েই ওরা জীবনের প্রথম ভোট দেবে আগামী ৫ মে। ওরা অর্থাৎ মেখলিগঞ্জ এনক্লেভ সেটলমেন্ট ক্যাম্পের স্বপ্নারানি রায়, মানিক রায়, যুগল বর্মন প্রমুখ। বেলা ১১টা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। সরকারি গাড়ি ক্যাম্পে প্রবেশ করতেই সাবেক ছিটবাসীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি। কার আগে কে নেবে ভোটের আইডেন্টিটি কার্ড। সিভিক পুলিশের তত্ত্বাবধানে লম্বা লাইন করে দাঁড়াল সবাই। এক-এক করে সবার হাতে তুলে দেওয়া হল পরিচয়পত্র। কার্ড বণ্টন সম্পন্ন হতেই ওদের প্রতিক্রিয়া, এটার জন্যই এতদিনের প্রতীক্ষা। ভারতের নাগরিক হিসেবে এবার তাহলে ভোট দেওয়া যাবে।

ভোট গণতন্ত্রের ভিত্তি। ভোটাধিকার নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিকের মর্যাদা, তার অহংকার। এতদিন যেটা স্বপ্নারানিদের স্বপ্ন ছিল, আজ সেটা পূরণ হল। দশকের পর দশক ধরে ওদের বসবাস ছিল ভারতীয় ভূখণ্ডে। অথচ ওদের ছিল না ভোটাধিকার। তবে ওদের পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে হয়ত বা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে তার পরবর্তী পর্বে ছিটমহলগুলি ভারতীয় গণতন্ত্রের অধিকার থেকে সম্পূর্ণ রূপেই ছিল বঞ্চিত। এবার সেই ছিটবাসীদের একটা সামান্য অংশ তাদের কাঙ্ক্ষিত নাগরিকত্বের অধিকার প্রয়োগ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কাকে ভোট দেবেন? প্রশ্ন শুনেই সাবেক ১১২ নং বাঁশকাটা ছিটমহল থেকে এ দেশে আসা স্বপ্নারানি রায় যেন হোঁচট খেলেন। 'কাকে ভোট দেব? এখনও তো বুঝতেই পারলাম না কোন দল কীরকম! কোন দলের কে প্রার্থী।'

মেখলিগঞ্জ শহরের অদূরে ভোটবাড়ির 'এনক্লেভ সেটলমেন্ট ক্যাম্প'-এর ৩ নং ঘর। সেই ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভোটের প্রসঙ্গ উঠতেই কিন্তু স্বপ্নাদেবী এই প্রতিবেদককে শোনালেন অন্য কথা, যার বিষয় ভোট নয়, একটি বেদনাময় ঘটনা। সময়টা ২০১৫-র নভেম্বর মাসের শেষ দিক। একমাত্র মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্ত অতিক্রম করছেন স্বপ্নারানি। অনেকটাই কন্যার পিতৃগৃহ ছেড়ে শ্বশুরালয় যাবার সেই বিয়োগান্ত দৃশ্য যেন। স্বপ্নাদেবীর স্বামী বলরাম বর্মন সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়ে সজল চোখে বিদায় দিচ্ছেন তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে। স্ত্রী ও কন্যা ভারতে চলে এলেও সত্তরোর্ধ্ব বলরাম বর্মন সরকারি পরিভাষায় বাংলাদেশি নাগরিকই রয়ে গেলেন।

২০১১ সালের জনগণনায় তাঁর নাম নথিভুক্ত হয় না। আর সেই কারণেই চরম এই দুর্দশা তাঁকে মাথা পেতে নিতে হয়। স্ত্রী ও কন্যার নাম জনগণনায় নথিভুক্ত হল অথচ বলরামবাবুর নাম বাদ পড়ে গেল! কী অদ্ভুত কাণ্ড। এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আজও বাংলাদেশে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন তিনি। ভারতীয় ছিটের বাসিন্দা হয়েও যিনি আজ বাংলাদেশি, তাঁরই স্ত্রী ও কন্যা আবার ভারতীয়। ছিটমহল বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতে একদিকে স্বপ্নারানি আগামী ৫ মে অংশ নেবেন পশ্চিমবঙ্গের ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনে, অন্য দিকে তাঁর স্বামী বাংলাদেশের লালমণির জেলার পাটগ্রাম উপজেলার নয়াবাউরা বাজারে সাইকেল মেরামত করতে করতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন।

একই অবস্থা সাবেগ দাশিয়ারছড়া ছিট থেকে আসা সারোয়ার আলমের। গত নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে দিনহাটার সাহেবগঞ্জ-বাগভাণ্ডার সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে দুই ভাই মিজানুর ও সারোয়ার। মিজানুরের স্ত্রী ও সন্তান এপারে এলেও সারোয়ারের স্ত্রী মেরিনা আখতার এবং দুই সন্তান হিমেল ও মুয়াদ পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে সীমান্ত অতিক্রম করার অনুমতি পায়নি। দীর্ঘ পাঁচ মাসেরও অধিক সময় অতিবাহিত অথচ এই সমস্যার সুরাহা আজ পর্যন্ত হল না। ১৫ এপ্রিল জেলা প্রশাসন সারোয়ারের হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দিলেও, তাঁর স্ত্রী মেরিনা আগামী ৫ মে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেল। তবে এ দেশে আসা দিনহাটা ক্যাম্পের ১৫৬ জন ভোটার হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র পাওয়াতে যারপরনাই আনন্দিত।

বহু লড়াই, বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাঁদের দেশবদল। 'ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল' নামক সংগঠন গড়ে এক অসম লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁরা ভারতে আসার ছাড়পত্র জোগাড় করেছেন। গত বছরের ৬-১২ জুলাই হেড কাউন্টিং চলাকালীন বাংলাদেশ প্রশাসনের একাংশ ও ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির লাগামছাড়া সন্ত্রাস বহু ভারতীয় ছিটবাসীর ভারতে আসার স্বপ্নকে নস্যাৎ করে দেয়। তা সত্ত্বেও ছিটবাসীদের এক সামান্য অংশ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হবার পূর্বমুহূর্তে ভারতে আসতে চেয়ে নাম লিখিয়েছিলেন। এর পরই ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার জেলার তিনটি 'এনক্লেভ সেটলমেন্ট ক্যাম্প'-এর মোট ৫৬৮ জন নতুন নাগরিকের ভোটদান ঘিরে সংবাদমাধ্যমের উন্মাদনা। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রশাসনিক তৎপরতা। চলছে ভোটদানের পদ্ধতি শেখানোর প্রশিক্ষণ।

গত বছরের ৬-১২ জুলাই হেড কাউন্টিং চলাকালীন বাংলাদেশ প্রশাসনের একাংশ ও ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় সমিতির লাগামছাড়া সন্ত্রাস বহু ভারতীয় ছিটবাসীর ভারতে আসার স্বপ্নকে নস্যাৎ করে দেয়। তা সত্ত্বেও ছিটবাসীদের এক সামান্য অংশ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হবার পূর্বমুহূর্তে ভারতে আসতে চেয়ে নাম লিখিয়েছিলেন।

দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি— এই তিনটি ক্যাম্পের যথাক্রমে ১৫৬, ১২৬ ও ২৮৬ জন ভোটার যে ভোট দেবার উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন তা ক্যাম্পবাসীদের কয়েকজনের কথায় পরিষ্কার। দিনহাটা ক্যাম্পের মৃণাল বর্মন কিংবা গজেন বর্মনরা হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র নিয়ে সিতাই বিধানসভায় (৬ নং) প্রথমবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন— এটা যেন তাঁদের কাছে এক পরম প্রাপ্তি। সত্তর ছুঁইছুঁই গজেন বর্মন সাবেক ছিট ১৫০ দাশিয়ারছড়ায় পতপত করে উড়তে থাকা ভারতের পতাকাকে সাক্ষী রেখে কখনও বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলেছেন, কখনও জাতীয় সংগীত গেয়ে সহকর্মীদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করছেন। কালীরহাটে ‘ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল’-এর দপ্তরে নিয়মিত ভারতের পতাকা উত্তোলন ও নামানোর মধ্যে দিয়ে ভারতের বৈধ নাগরিকত্বের স্বপ্ন সফলের আকাঙ্ক্ষা আজ পূরণ হবার পথে— এটা তাঁর কাছে ঈশ্বরের পরম করুণা। ২০১৪ সালের ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করতে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকি হজম করে ভারতীয়ত্ব রক্ষার আন্দোলনে অবিচল থাকার সুফল এবার পেতে চলেছেন গজেনবাবু। ভারতের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়েছে। ভোটার কার্ড হাতে নিয়ে ভোট দেবেন স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে— এটা তাঁর কাছে স্বপ্নই বটে।

একইভাবে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত সাবেক ভারতীয় ছিটমহল কোটভাজনীর তরুণ যুবক কৃষ্ণ রায়, দহলা খাগড়াবাড়ির গণেশ বর্মন কিংবা নিমাই রায় প্রমুখর স্বপ্ন ছিল, ছিটমহল বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে ভারতের নাগরিকত্বলাভ ও মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা। একইভাবে মণিকা মুর্মু ও মানিক হেমব্রম ভারতে এসেছেন শান্তিতে বসবাস করবার প্রত্যাশা নিয়ে। তাঁরা ভারতের নাগরিক হিসেবে মাথা উঁচু করে জীবন অতিবাহিত করবার স্বপ্ন নিয়ে হলদিবাড়ির ভাঙাপাড়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাড়ি জমান। এঁদের সকলেরই ঠাঁই এখন হলদিবাড়ির ‘এনক্লেভ সেটলমেন্ট ক্যাম্প’-এ। এঁরা সকলেই আগামী ৫ মে ১ নং মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার হিসেবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন। ভারতের নাগরিক হিসেবে ভোটদান তাঁদের কাছে যে কতটা মর্যাদার তা তাঁদের থেকে কেউ বেশি জানে না। কারণ, এতদিন তাঁরা জেনেছেন, ভারতে ভোট হয় অথচ ভারতীয় ভূখণ্ড হিসেবে ছিটমহলের বাসিন্দা হয়েও তাঁরা ভোট দেবার অধিকার থেকে অনেক দূরে। অনেক লড়াই, অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ৯২১ জন ভারতীয় ছিটবাসী ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছেন। এবার ওই সংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা পশ্চিমবঙ্গের ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। এই নির্বাচন যে সেদিক থেকে এক অন্য মাত্রায় উন্নীত হতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একইভাবে সাবেক ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহল আজ ভারতের মূল ভূখণ্ডে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এর ফলে সেখানকার বাসিন্দারা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। বাংলাদেশি ছিটমহলের কোনও বাসিন্দাই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা এবার নির্বাচনে অংশ নেবেন। মূলত বাংলাদেশি ছিটসমূহের বাসিন্দারা ১ নং মেখলিগঞ্জ, ৫ নং শীতলখুচি, ৬ নং সিতাই, ৭ নং দিনহাটা এবং ৯ নং তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন। সরকারি মতে, মোট ৯,৭৭৬ জন নতুন করে নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ভূখণ্ড বিনিময় প্রক্রিয়ার কারণেই এই নতুন নাগরিক হসেবে প্রতিপন্ন হওয়া। ফলত তাঁদের ভোটদান প্রক্রিয়ার দিকে যে সকলেরই নজর থাকবে, সে তো বলাই বাহুল্য। যদিও নিন্দুকরা বলেন, সাবেক বাংলাদেশি ছিটসমূহের সিংহভাগ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক নাকি বহু আগে থেকেই তাঁদের নাম ভারতের ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করে ফেলেছিলেন। আর এর আগের বিভিন্ন নির্বাচনেও তাঁরা ভোট দিয়ে আসছেন। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রে বিস্তর লেখালেখির সুবাদে তা স্থানীয় মহলে জোর চর্চার বিষয়। তবু তর্কের খাতিরেও এ কথা আজ বলতেই হবে যে, নতুন নাগরিক হিসেবে এবারের নির্বাচনে তাঁদের অংশগ্রহণ ছিটমহলের ইতিহাসে এক নতুন পালক।

দেবব্রত চাকী

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি- ০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস- ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক- ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস- ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর- ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
মালবাজার
ভবতোষ রায়চৌধুরী- ৯৮০০৩০৬৫২৭
চালসা
দিলীপ সরকার- ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল- ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা- ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায়- ৯৯৩২৫৪৬৩২০
ময়নাগুড়ি
দেবাশিস বসুভাট- ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে- ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল- ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড়- ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস- ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা- ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা- ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি- ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি- ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার- ৯৪৩৪৪২৩৫২২

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

মনপসন্দ ডিজাইন ও সুলভ মূল্য গয়নার দুনিয়ায় ফেলেছে আলোড়ন

বাংলা ১৪২৩ বর্ষের সূচনায় সমস্ত মানুষের মঙ্গল প্রার্থনা করে বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড। সেই সঙ্গে সকলের সুস্বাস্থ্য ও স্বপ্ন পূরণেরও কামনা করে। নতুন বছরের শুরুতেই বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড গয়নাপ্রেমীদের জন্য হাজির করেছে আরও মনপ্রিয় ডিজাইনের অলংকার এবং তা ক্রেতা সাধারণের হাতে তুলে দিচ্ছে অবিশ্বাস্য কম দামে। যে সব ডিডাইন একান্তভাবেই বঙ্গতনয়া থেকে শুরু করে গৃহবধূদের পছন্দ এবং যেগুলি তাঁদের আরও বেশি সুন্দর করে তোলে সেই সব গয়নাতে বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড সংযোজন করেছে অভিনব মাত্রা। বছরের শুরু একদিকে যেমন উৎসবের সময় তেমনভাবেই এই কালেই বঙ্গের অধিকাংশ নর-নারীর জীবনে ঘটে বৈবাহিক মিলন। সে কথা মাথায় রেখেই **আকর্ষণীয় ডিজাইনের** পাশাপাশি বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড দিচ্ছে **আকর্ষণীয় ছাড়!** এক একটি গহনার সেটে যে পরিমাণ রিবেট মিলছে তা

সত্যিই অবিশ্বাস্য।

ডুয়ার্স রমণীরা এখনও সেই ঝুমকো, সেই কানবালা কিংবা আয়স্তি অথবা কঙ্কন মায়ায় জড়িয়ে আছে। শুধু ডুয়ার্সবাসী কেন বঙ্গ নারী মনের কোনে লুকনো বাসনা তো তাই! তারা যেমন দুঃসাহসিকভাবে ভালবাসেন রাজস্থানী কুন্দন, সেই সঙ্গে পছন্দ করেন আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুরী ছাঁদের অননুকরণীয় ধরন। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির ছাঁদের আভরণ সাজ কিংবা সেমি প্রেশাস কস্টিউম জুয়েলারিও থাকে তাঁদের পছন্দ তালিকার শীর্ষে। তাই খাঁটি তামার মধ্যে সোনার নকশা অনুকরণ করে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ২৩ ক্যারেট গোল্ড প্লেটেড থেকে রূপ দেওয়া হল ব্রেসলেট, নেকলেস, চেন, লকেট এমনকি মুক্তোর অলংকার। খাঁটি সোনার গহনা সবার সাধ্যে কুলোয় না। তা বলে কি মধ্যবিত্ত তনয়া বা বধূরা গহনার সাজে অপরূপা হবে না! ওদের কথা ভেবেই তো স্বর্ণালঙ্কারের বিকল্প মাইক্রোগোল্ড এনেছিলেন বিশ্বজিৎ পোদ্দার। উত্তর-পূর্ব ভারতে গয়নাকে ফরমুলার খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়েছিল তো তাঁরই নকশাকাররা।

তারপরই কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে কলকাতার পার্ক সার্কাস, বিরাটি, হাওড়া সহ আসাম ও এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়েছে **বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড**-এর একাধিক শো-রুম।

অবিশ্বাস্য স্বল্প মূল্যে গয়নার ফ্যাশনে এই বিপ্লব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল আই এস ও-র স্বীকৃতি। তারপর সেই মুকুটেই যুক্ত হয়েছে আরও একটি পালক। গহনা তৈরির জন্য প্রথম রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের নমিনেশন তো গত বছরের শুরুতেই মিলেছিল, এছাড়াও আছে মিলেছে নানা প্রশংসা ও স্বীকৃতি। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশে অভাবনীয় সাফল্যের কারণে খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে মিলেছে বিশাল সম্মান। স্বাধীনতার উনসত্তরতম দিবসে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গভূমি উৎসবে অংশ নিয়েছিল বি পোদ্দার মাইক্রোগোল্ড। দেশ তথা দেশের বাইরে তাদের গয়না নিয়ে প্রদর্শনীতে ব্যবসার জন্য মিলেছে অবাধ ছাড়পত্র। একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এর থেকে বেশি সাফল্য আর কী হতে পারে।

P.M.E.G.P. Unit
under K.V.I.C.,
Govt. of India

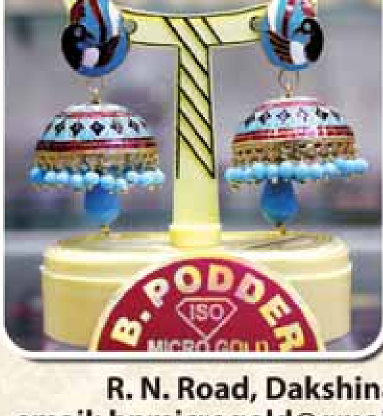

উত্তরবঙ্গে মাইক্রোগোল্ডের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান

B. PODDER
MICRO GOLD

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

স্বল্প পুঁজিতে ঘরে বসে ব্যবসায়ে ইচ্ছুকরা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

R. N. Road, Dakshinayan Building 2nd Floor, Cooch Behar, Pin - 736101 (W.B.)
email: bpmicrogold@gmail.com, Phone : 03582-228597, 98320 92714, 8967863754

বাম-শরিকদ্বয়ের ডুয়ার্সের ডেরা কি এবার উৎখাত হওয়ার মুখে?

বিবর্তনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময়ে ছিল সিংহরই রাজত্ব। তারা ভারতের সব বনভূমিতেই প্রবল বিক্রমে রাজত্ব করত। জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, দশ হাজার বছর আগে শুধু ভারত নয়, আফ্রিকা মহাদেশ, ইউরেশিয়া, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগেও সিংহ বিচরণ করত। ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে এর বিলোপের কারণ হিসেবে মনে করা হয়, সেখানে ঘন বনভূমির উন্নয়ন আর জনবসতির ফলে খাদ্য শিকারের অভাব। ভারতের সিংহর বিতাড়ন ঘটেছিল এই কারণগুলি ছাড়াও এশিয়ার উত্তর ভাগ থেকে আসা অনেক বেশি ক্ষিপ্র ও আক্রমণপটু বাঘের আগমন ও দাপটের ফলে।

আলোচ্য প্রতিবেদনটি বন্য প্রাণী তথা আজকের লুপ্তপ্রায় ভারতীয় সিংহকে নিয়ে নয়, রাজনৈতিক সিংহকে নিয়ে। বন্য প্রাণী সিংহ ভারতীয় জনজীবনে বহু প্রাচীনকাল থেকেই নানা লৌকিক তথা কথাসাহিত্যে জায়গা পেয়ে এসেছে। সিংহ শক্তি ও শুভর প্রতীক হিসেবে বাঘের পরিবর্তে পশুরাজ বলে চিহ্নিত হয়েছে। অশুভ শক্তির বিনাশে সে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার বাহন রূপে পূজিত হয়।

আধুনিক ভারতীয় রাজনীতিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শৌর্যকে সিংহর শৌর্যের মধ্যে যাতে ধরে রাখা যায়, তার জন্য নেতাজি প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব তাঁদের দলীয় প্রতীকে সিংহকে উপস্থিত করেছেন কি না, সেটা তাঁরাই বলতে পারবেন। তবে ভারতীয় সিংহ বলতে যেমন বোঝায় গুজরাতের গির অভয়ারণ্য, তেমনই রাজনৈতিক মহলে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক 'ব্র্যাকেটে দিনহাটা'। এর মূল কারণ শুধু দিনহাটার কমল গুহ ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাণপুরুষ ছিলেন তা-ই নয়, বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে তিনি যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাতে কংগ্রেসের একচ্ছত্র অগ্রগতি এবং এই জেলায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুললেও দু'টি আসন ছাড়া জেলার সব ক'টি বিধানসভা আসনই ফরওয়ার্ড ব্লকের বিজয়ের ঝুড়িতে তুলে এনেছিলেন।

একই রকম না হলেও আরএসপি সম্পর্কেও বলা যায়, নেতা ত্রিদিব চৌধুরী পর্তুগাল সাম্রাজ্যবাদীর হাত থেকে গোয়াকে উদ্ধার করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার আন্দোলনের মধ্যে এই দলটির অবস্থানকে দৃঢ় করেছিলেন। সভ্যতার বিকাশের প্রধান উপকরণ কৃষিকাজের কোদালকে তাদের দলীয় নির্বাচনী প্রচারের চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করলেও, তাদের উত্তরবঙ্গের মাটিতে রাজনৈতিক সংগঠনের বীজ বপিত হয়েছিল ডুয়ার্সের চা-বাগিচার শ্রমিকদের মধ্যে।

রাজনৈতিক সিংহর বিস্তারের আয়তন হয়ে চলেছে ক্রমশ সংকুচিত। মাঝখানে বীরভূম-বাঁকুড়াতে ফরওয়ার্ড ব্লক কিছুটা ছড়াতে পারলেও আজ তার অস্তিত্ব একই রকমভাবে সংকুচিত হয়ে চলেছে। সে হতেই পারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আছে জোয়ারভাটার মতোই উত্থান-পতন। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের অস্তিত্ব তো ভারতীয় সিংহর মতোই এখন বিপন্ন। সিংহ যেমন বাঘের দাপটে ভারত থেকে ক্রমশ অপসারিত হয়েছে, এই রাজনৈতিক সিংহও যেন খোদ ফরওয়ার্ড ব্লকের অভয়ারণ্য কমল গুহর দিনহাটা থেকেই অপসৃত হয়ে চলেছে।

একটা বামপন্থী দল থেকে একের পর এক কর্মী কেন এমনভাবে ক্রমাগত দক্ষিণপন্থী তৃণমূলের মঞ্চে যোগ দিচ্ছেন? বলা তো হয়, বাম-দলগুলি যে নামেই হোক না কেন, তারা একটা দর্শনকে বিশ্বাস করে বামপন্থী দলে যোগ দেয়। ফরওয়ার্ড ব্লক অবশ্য প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী ছিল তা-ই নয়, তারা নেতাজিকে জাপানের কুইসলিং বলার জন্য সে দিন কমিউনিস্ট দলের সদস্যদের আক্রমণকে তাদের কর্মসূচি হিসেবে নিয়েছিল।

যাঁরা কোচবিহার শহরের প্রবীণ বাসিন্দা, বয়সের ভারে যাঁদের স্মৃতিশক্তি এখনও অটুট আছে, তাঁরা হয়ত ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই কোচবিহার শহরের রাজপথে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ভিয়েতনাম মিছিলের দিন দু'টি ফ্রক পরিহিতা মেয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে কেমন প্রকাশ্যে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিল, সে কথা মনে রেখেছেন। একজনের নাম ফরওয়ার্ড ব্লক পরিবারের অপরাজিতা গোপ্পী, পরে ইনি এই দলের প্রতিষ্ঠিত নেত্রী। অপরজন সিপিআই পরিবারের গীতা লাহিড়ি, পরবর্তীকালে ইনি এই শহরের কমিউনিস্ট নেতা ও প্রখ্যাত রেডিয়োলজিস্ট ড. দেবী লাহিড়ির স্ত্রী।

আজকের কট্টর বামপন্থী দল ফরওয়ার্ড ব্লক যে এক সময় তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী ছিল, তার একটা উদাহরণ এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভার স্পিকার তখন কেশবচন্দ্র বসু। সময় ১৯৬২ সালের ২৪ ডিসেম্বর। বিধানসভায় স্পিকার ঘোষণা করলেন, বিধায়ক জ্যোতি বসু, গণেশচন্দ্র ঘোষ, মনোরঞ্জন রায়, ভদ্রবাহাদুর হামাল, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া বর্ধমান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন, হরেকৃষ্ণ কোঙারকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এঁদের সবাইকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের দিনহাটা থেকে নির্বাচিত সদস্য কমল গুহ উঠে দাঁড়িয়ে জানালেন, তিনি মাননীয় স্পিকারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, 'কমিউনিস্টদের যে গ্রেপ্তার করা হল, এত দেরিতে কেন করা হল? আগে কেন করা হয়নি? যাঁরা কমিউনিস্টদের নিচের তলায় আছেন, যাঁরা রেস্টুরেন্ট, সিনেমায়, মাঠে-ঘাটে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন চিনের পক্ষে, তাঁদের আজ পর্যন্ত কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না?'

স্পিকার— 'সে প্রশ্ন এখানে আসে না।'

কমল গুহ— 'আমি বলছি, এখনও কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না?'

স্পিকার— 'সে প্রশ্ন এখানে আসে না।'

এর পর তুফানগঞ্জ থেকে নির্বাচিত কমিউনিস্ট বিধায়ক জীবন দেবের দিকে

আঙুল তুলে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কমল গুহ যে সমস্ত ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন তা সংসদীয় ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অশালীন বলে বিবেচিত হওয়ায় স্পিকারের নির্দেশে ভাষাগুলিকে বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ফরওয়ার্ড ব্লক সে দিন যে কমিউনিস্ট পার্টিকে চিনের সমর্থক বলে অভিযোগ তুলে তাদের গ্রেপ্তার করার দাবি তুলেছিল, তারাই আবার তাদের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডলকে সভাপতি করে ভারত-চিন মৈত্রী সমিতি গঠন করে প্রচণ্ড চিনা ভক্ত হয়ে ওঠে।

মুশকিলটা এখানেই। রাজনৈতিক দলগুলি যদি নীতিকে বর্ষাকালের আকাশের মতো ঘন ঘন পালটে ফেলতে পারে তাহলে তাদের সদস্যরাও সময় ও সুযোগ বুঝে দল যে পালটাবে না, তার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। হিতেন বর্মন, অমর রায় প্রধান বা তাঁর পুত্র যদি সিংহর কেশর উপড়ে ফেলে ঘাসফুলের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজেন, তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বারাসতের ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক সরল দেব তো সেখান থেকে অনেক আগেই সিংহকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ধাক্কায় বিদায় জানিয়েছিলেন। রাজনৈতিক সিংহ তো এখন নখদন্তহীন। একের পর এক সিংহর কেশর উপড়ে নেওয়ার যন্ত্রণায় সে শুধু আর্তনাদ তুলতে পারে, কিন্তু নখ বার করে প্রতিরোধ তো দূরের কথা, হালুম শব্দটিকে গলা দিয়ে বার করার শক্তিও দেখাতে পারছে না।

আসলে সিংহ যেমন বাঘের দাপট থেকে বাঁচতে গুজরাতের গির অভয়ারণ্যে আশ্রয় নিয়েছে, তৃণমূলের দাপটে রাজনৈতিক সিংহও দিনহাটার রাজনৈতিক বনভূমিকে আর নিরাপদ ভাবতে পারছে না। এখনও পর্যন্ত সর্বশেষ সংযোজন, কমল গুহর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী তাঁর পুত্র উদয়ন গুহর তৃণমূলের ঘাসফুলের নিরাপদ আশ্রয়ে যোগদান।

উত্তরবাংলার আরেক বামপন্থী দল আরএসপি ছিল ডুয়ার্স চা-বাগিচা শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও শক্তিশালী দল। এখন কোদাল-বেলচা ছেড়ে ঘাসফুলে জল দেবার জন্য লাইনে। আসলে ডুয়ার্সের দখল নেওয়ার জন্য সিপিএম লড়াই চালিয়ে গিয়েছে বহুদিন ধরেই। বারবার তাই তাদের দেখা গেছে ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি'র সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে। যেখানেই শরিকদের প্রাধান্য বেশি সেখানেই সিপিএমের প্রধান শত্রু ছিল কংগ্রেস নয়, তারাই। সিপিএমের হাতে মার খেয়েও যখন তাদের সাধারণ কর্মীরা দেখেছে মন্ত্রিত্বের লোভে নেতাদের হেলদোল নেই তখন বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে তাদের মনে। ক্রমে সেই ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে একদিন

৩৪ বছরের বাম ঐক্যে আজ ঘুণ ধরেছে?

আসলে ডুয়ার্সের দখল নেওয়ার জন্য সিপিএম লড়াই চালিয়ে গিয়েছে বহুদিন ধরেই। বারবার তাই তাদের দেখা গেছে ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি'র সঙ্গে বারবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে। যেখানেই শরিকদের প্রাধান্য বেশি সেখানেই সিপিএমের প্রধান শত্রু ছিল কংগ্রেস নয়, তারাই। সিপিএমের হাতে মার খেয়েও যখন তাদের সাধারণ কর্মীরা দেখেছে মন্ত্রীত্বের লোভে নেতাদের হেলদোল নেই তখন বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে তাদের মনে। ক্রমে সেই ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে একদিন বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিকল্প হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে তৃণমূলকেই।

বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিকল্প হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে তৃণমূলকেই। ফব বা আরএসপি-র নেতারা সেই দলত্যাগের রাশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি।

ফলস্বরূপ দেখা গেছে বামফ্রন্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার অনেক আগে থেকেই ফরওয়ার্ড ব্লকের ভাঙন। আজ কোচবিহার জেলার ন'টি আসনের চারটিতেই তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন চার প্রাক্তন ফব নেতা। ফব সাংসদ তৃণমূল থেকে জিতে মন্ত্রী হয়েছেন, সাংসদ-পুত্র দীর্ঘদিন যুবলিগ করার পর তৃণমূলে যোগ দিয়ে বিধায়ক হয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগঠন ভাঙতে ভাঙতে আজ সত্যিই এই প্রান্তিক জেলায় সংকটের মুখে। উদয়ন গুহ জোড়াফুল জিহ্নে জিতে বিধায়ক হলে সেই ষোলোকলা পূর্ণ হবে বলা যায়— বাকিরা জিতলেও দল ধরে রাখার ক্ষমতা তাদের নেই।

একই অবস্থা আরএসপি-র। এরাজ্যে তাদের হেড অফিস বলতে আলিপুরদুয়ার জেলা, গত পাঁচ বছরে বিশাল সংখ্যক নেতা-কর্মী চলে গিয়েছে তৃণমূলে এবং বিজেপিতে। তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই। আজ আরএসপি-র সাংগঠনিক অবস্থা এমন দুর্বল জায়গায় পৌঁছেছে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট ঘোষণার পর এতদিনের পুরনো বড় শরিক তাদেরকে খোলাখুলি উপেক্ষা করতে শুরু করেছে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর সিপিএমের পথ অনুসরণ করে আরএসপি-কে গুরুত্ব দিচ্ছে না কংগ্রেসও। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে ক'টি আসনে আরএসপি-র জয়ের সম্ভাবনা আছে তা পুরোপুরি নির্ভর করছে সিপিএম বা কংগ্রেসের শেষ মুহূর্তের 'মুড'-এর উপর।

নিজের ডেরায় দলের এরকম করুণ অবস্থা হবে কোনও দিন সে কথা কি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেছিলেন কমল গুহ বা যতীন চক্রবর্তীর মতো দুঁদে নেতারা? যাঁরা প্রয়োজনে বড় শরিকের বিরুদ্ধে হুংকার দিতেও কখনও দ্বিধাবোধ করেনি, যাঁরা নিজেদের ডেরায় সিপিএমকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেননি। আজ তাদের দুর্জয় ঘাঁটিতে অস্তিত্ব বিপন্ন দেখে হাত তুলে দিয়েছে সিপিএম, নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই উনচল্লিশ বছরের বাম জোটকে কাঁচকলা দেখিয়ে জড়িয়ে ধরেছে চিরদুশমন কংগ্রেসকে— জনগণের জোট আখ্যা দিয়ে। বিখ্যাত বামফ্রন্টে আজ যে বিশাল ফাটল দেখা দিয়েছে তার মেরামতির সাধ্য আছে কার?

সৌমেন নাগ

আকাশ দেখতে বক্সায়

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে গেল অনেকে, ট্রেন প্রায় ফাঁকা। এই প্রথমবার আমরা নামলাম না। নিউজলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত সদ্য শারদীয়ার সাদা কাশফুলের সম্ভার, ছোট ছোট নাম-না-জানা নদী আর সুড়ঙ্গ, পাহাড়ের সারি তাদের অনাবিল সৌন্দর্য দিয়ে ধরে রাখল আমাদের। বহুদিন পর সেই সৌন্দর্যকে আমরা চোখ দিয়ে আস্বাদন করলাম বুভুক্ষুর মতো। এবার আমাদের যাত্রা জয়ন্তী-বক্সা-লেপচাখা-রাইমাটাং।

আলিপুরদুয়ার থেকে জয়ন্তীর পথে দেখে নিলাম রাজাভাতখাওয়ার সংগ্রহশালা— নেচার ইনটারপ্রিটেশন সেন্টার। খাঁচায় রাখা লেপার্ড পরিবার ও তাদের জীবনযাপন, অর্কিডের সংগ্রহ, জন্তুদের সবল করার জন্য আনা বিদেশি ঘাস প্রভৃতি। আর দেখলাম অমিয়ভূষণ মজুমদারের অবদান। এরপর জঙ্গলকে দু'ধারে রেখে পৌছলাম জয়ন্তীর 'প্রকৃতি' লজে। পথে পেরিয়ে এলাম বালা নদীর শুকিয়ে যাওয়া বিস্তীর্ণ চর। রেল-ব্রিজের দুটি স্তম্ভ পরিত্যক্ত হয়ে এ পথে একদা ট্রেন

যাওয়ার স্মৃতি বহন করছে। ১৯৯০ সালে পরিবেশ মন্ত্রী মানেকা গান্ধি পরিবেশ সুরক্ষিত করতে সুপারিশ করায় ১৯৯৩ থেকে এখান দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে এই স্তম্ভ দুটি পরিত্যক্ত অবস্থায় বেদনামলিন।

প্রকৃতি লজে থাকাটা বেশ মনোরম। জয়ন্তী নদীর ধারে বন বিভাগের একটিই বাংলো। তাতে আমাদের স্থানসংকুলান হয় নি, তাই দূরে এই লজে আমাদের আপাত আশ্রয়। সামান্য বিশ্রামের পর বেরোলাম জয়ন্তী পাহাড়ের মাথায় পুকরী মাঈ-এর উদ্দেশে,পথে পড়ল শাল-সেগুন-চিলোনী ঘেরা জঙ্গল। এই অঞ্চলে জলের দেখা মেলে অনেক নিচুতে। সরকার বাহাদুর ৩০০ ফুট গর্ত করেও জলের দেখা পাননি। অথচ এই জঙ্গলে ওই বিশাল পুষ্করিণী রীতিমত বিস্ময় উদ্রেক করে। সব ধর্মের শ্রদ্ধাও পায়। এখানে থাকা কচ্ছপ ও মাছদের কেউ বিরক্ত করে না, সামান্য খাবার ছড়িয়ে দিলে তারা নির্ভয়ে এসে তা খেয়ে যায়। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ শন্ শন্ করে মেশিন চলার আওয়াজে চমক খেয়ে মুখ ফেরাতেই আমাদের পথপ্রদর্শক জানালেন, ওটা ধনেশ

পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ। জঙ্গলের ভেতর প্রাক্ সন্ধ্যায় ওই বিশাল পুষ্করিণীর প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সেই শব্দকে অধিভৌতিক বলেই মনে হয়েছিল।

লজে ফেরার পথে ফের শব্দ। তবে এবার ঘণ্টা নাড়ার মতো একটা মিষ্টি আওয়াজ। চমৎকৃত হয়ে অনুসন্ধান করলাম, জঙ্গলে মন্দির আছে নাকি, সন্ধ্যারতি হচ্ছে? উত্তর পেলাম— না, ওটা কাঠ ঝিঁঝিঁরা পেটের মধ্যবর্তী মাংসপিন্ডে আঘাত করে সঙ্গীকে মিলনে আহ্বান করছে। শব্দ তো নয় এমন মাদকতাময় ধ্বনি যাতে আমাদেরই সাড়া দিতে ইচ্ছে হয়। সারাটা জীবন বোধ করি এমন একটি আহ্বানের জন্যই কাটিয়ে দেওয়া যায়। অদ্ভুত মিষ্টি, চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনলে সেই নিস্তব্ধ জঙ্গলে কেমন ঘোর লেগে যায়।

সন্ধ্যার আঁধার নেমে এল, জঙ্গলে আর থাকা চলে না। তবু সাহসে ভর করে গেলাম জঙ্গলের এক গভীর অঞ্চলে। এক কোণে মাচা বেঁধে আছে জঙ্গলের বেড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার প্রহরীরা। তাদের মাচার স্বল্পপরিসরে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। নিঃশ্বাস গেল বন্ধ হয়ে। সবুজ বনভূমির মাঝে গোল একটি জলাধার, পাশে সাদা নুন পাথর, জঙ্গলের প্রাণীদের নুন আর জল খাবার সময় হয়েছে। একটা চাপা আলো সেখানে এক অদ্ভুত রহস্যের জন্ম দিয়েছে। গায়ে কাঁটা দেওয়া সে এক অনন্ত প্রতীক্ষা- এই বুঝি কোনও প্রাণী এল!

রাতে গেলাম জয়ন্তী নদীর চরে। অনেকখানি হাঁটার পর পেলাম মূল স্রোত, কলকল ছলছল করে সগর্বে বয়ে চলেছে। ভেসে যাচ্ছে চরাচর কোজাগরী জ্যোৎস্নায়। মাঝে মাঝে কালো মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে সবকিছু। নিস্তব্ধ সাদা উপলময় চরাচরে জেগে আছে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত এক রেল-ব্রিজ আর একটি নিষ্পত্র গাছ, দুটি হাত তুলে আকাশপানে অভিযোগ জানাচ্ছে কাউকে, অভিমানে একাকী। গানে কবিতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল চাঁদ আমাদের আড্ডায়। নিরাপত্তার কারণে ফিরে যেতে হল লজে। সামনের খোলা উঠোনে জমে গেল রাতের খাওয়া।

ভোরবেলা বেরোলাম জঙ্গল সাফারিতে। ইয়েলো স্পটেড ব্ল্যাক স্পাইডারের অসীম ধৈর্য্য ও জ্যামিতিক শিল্পসমন্বিত জাল বোনা দেখলাম। মন ক্যামেরায় তোলা হল নাম না জানা অজস্র ফুলের রঙিন ছবি আর মনের কোণে সারাক্ষণ বেজে রইল কাঠ ঝিঁঝির সেই মাতাল করা ঘণ্টাধ্বনি।

ফিরে এসে জলযোগের পর রওনা দিলাম লেপাচা খা-র উদ্দেশে। সান্তালাবাড়ি পর্যন্ত গাড়ি আমাদের সঙ্গ দিল, তারপর শুরু হল চড়াইয়ের পথে হাঁটা প্রায় ৫ কিমি। পথে ক্লান্তি নিবারণের জন্য তৈরি ছিল অজস্র রঙিন সুন্দর প্রজাপতির ওড়াউড়ি, অর্কিডের বাহার, গোকুল (লাইট পোস্টের মতো সাদা কান্ড আর কোণাকৃতি শীর্ষ) গাছ, অমলতাস, চিলোনী গাছের পাহারা, হাতির উচ্ছিষ্ট

বহু দিন বাদে এমন করে শুধুই জঙ্গলের পথে পথে জঙ্গলের স্বাদে গন্ধে ভরা ক'টি দিন কাটালাম কী অনাবিল শান্তি। মাথার উপরে স্বচ্ছ ঘন নীল আকাশ। আশেপাশে শুধুই অনাবিষ্কৃত সবুজ পাহাড়ের সারি। লোকালয়ের বিশেষত শহরের মালিন্যবর্জিত ঝরঝরে ঝরনা। সবকিছুই বড় মুগ্ধ করেছে।

সেগুন ডাল ইত্যাদি। পথে খানিক বিরতি। রোভার্স-ইন রেস্টুরেন্টে খাওয়া। সামনের বক্সাঝোরায় গা ভিজিয়ে এসে আলাপ হল রেস্টুরেন্টের মালিক ইন্দ্র দাজুর সঙ্গে। ওখানকার আসন্ন দশেরা উৎসবের প্রস্তুতি চলছিল, আমরাও মেতে উঠলাম। ইন্দ্র দাজু শোনালেন রবীন্দ্রনাথের গান— তুই ফেলে এসেছিস্ কারে, যদি তোর ডাক শুনে... বাংলার মধ্যেই কলকাতা থেকে এত দূরে অবাঙালি কারও গলায় ব্যাঞ্জো বাজিয়ে শুনতে পাব রবীন্দ সংগীত ভাবিনি।

জমজমাট এক দুপুরের খানা খেয়ে আবার চড়াই ভাঙা। দু'পাশে সবুজে সবুজে ঢাকা গিরিখাত তার প্রভূত সৌন্দর্য নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে। উঠে গেলাম বহুদূর, চারপাশে পাহাড় ঘেরা এক ছোট্ট গ্রাম লেপচাখা। সেখানেই আমাদের ডেরা। ভীষণ আকর্ষণীয় এই বাংলোটি। সামনের বারান্দায় বসে সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। কোনও মতে বাঁদিক পানে ঘাড় ঘোরালে সূর্যোদয় আর ডানদিক পানে সূর্যাস্ত। বসে থাকতে থাকতেই সন্ধ্যায় বিশ্বচরাচর প্লাবিত করে চাঁদ উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভেসে গেল যত মালিন্যসহ যা কিছু।

পরদিন সকালে উঠে গেলাম কাতলুং নদীতে স্নান করতে। প্রায় পাঁচ কিমি উৎরাই নেমে নদীর চরে অগাধ জলক্রীড়া হল। সবশেষে উপল বিছানো নদীর বুকে গাছের পাতা পেতে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সারলাম। আবার সেই পাঁচ কিমি চড়াই ভেঙে যখন উঠে এলাম শরীরের সব শক্তি নিঃশেষিত প্রায়। একটু পরেই পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল আকাশে সূর্যাস্ত সব বেদনা ভুলিয়ে দিল। বিশাল নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে সাদা পেঁজা তুলোর বিরাট এক সিন্ধুসারস বা ময়ূর, যার চোখে অস্তগামী সূর্যের কারিকুরি আর গায়ে রামধনু রঙের অজস্র ছিটে। দেখতে দেখতে কেমন হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। চমক ভাঙতেই আকুল হয়ে ক্যামেরায় খানিকটা ধরতে ছুটে গেলাম।

বিদ্যুৎহীন বাংলোর হাতায় হল ক্যাম্পফায়ার। আগুন সাক্ষী রেখে মাথার উপর একলা গোল চাঁদকে কেন্দ্র করে শুরু হল গান আর সমবেত নৃত্য। ভুটান থেকে এসেছিলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর ডম্‌গো (দোতারা) বাজিয়ে শোনালেন। সৌর বিদ্যুতে একটি আলো জ্বালার ব্যবস্থা অবশ্য এখানে ছিল। কিন্তু ৩২০০ ফুট উপরে আলোকবিহীন ওই নিস্তব্ধতাকেই আমরা সবাই খুব উপভোগ করছিলাম।

রাত থেকে শুরু হল বৃষ্টি। তবে ভোর হতেই চরাচর জুড়ে শুধু সাদা মেঘের ঘোরাঘুরি। বারান্দায়, ঘরের ভেতরেও মেঘেরা আদর দিতে শুরু করল। মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমরা, মন খারাপও হল। এমন একটা সুন্দর স্বর্গের কাছাকাছি থেকে আজই নেমে যেতে হবে!

প্রায় ন'টা নাগাদ বেরোলাম উপত্যকার পথ ধরে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এসে পৌঁছলাম বক্সা দুর্গে। ভগ্নমলিন প্রবেশ (!) পথে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে লেখা রাজবন্দীদের বন্দনালিপি এবং তার প্রত্যুত্তর। মর্মরে খোদাই করা আছে। অবহেলিত বক্সাদুর্গে জনৈক মন্ত্রীর উদ্বোধন করা প্রস্তরফলক যদিও আছে তবুও অবহেলাও স্পষ্ট। টেনিস কোর্ট, রিজার্ভার, সেলগুলি, ভগ্নপ্রায় প্রাচীর সবই পরিচর্যার দাবী রাখে।

বক্সা দুর্গ থেকে নেমে প্রায় ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে এলাম সান্তালাবাড়ি। এখানেই গাড়ি আমাদের অপেক্ষায়। স্থানীয় হাট বসার দিন সেটি। পথে দেখা হল এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে, সকলেই তাদের সাপ্তাহিক বাজার সওদা করে নিয়ে যাচ্ছে।

সান্তালাবাড়ি থেকে জঙ্গলের পথ ধরে এলাম রায়মাটান বা রাই মাতুং। পথে পড়ল রাইমাতুং নদী এবং আরও অনেক ছোটখাট সরু নদী যারা এখন শীর্ণকায়া হলেও বর্ষায় যে ভয়াল রূপ ধারণ করে তার স্মৃতি সর্বত্রই প্রকট।

রায়মাটানে থাকলাম সোনাখেরি লজে। টিপটিপ বৃষ্টি অপূর্ব সুন্দর বাংলো, ঝপ করে নেমে আসা অন্ধকার। এতে আমরা এত আপ্লুত হয়ে গেলাম যে সঙ্গে সঙ্গে শিলবাংলো, ফুন্টশিলিং যাবতীয় ভবিষ্যৎ গন্তব্যস্থল নাকচ করে আমরা এখানেই দু'রাত কাটা কাটাবো— সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

পরদিন সকালে গেলাম কুয়াপাড়া হয়ে রাঙামাটি টি এস্টেট দেখতে। সেন্ট্রাল ডুয়ার্স অঞ্চলটি এত মনোরম— যতদূর চোখ যায় শুধু বিস্তীর্ণ সবুজ চা বাগান আর রেনট্রির সমাহার। ভুটান পাহাড়ের হাতছানি আমাদের অনেক দূর নিয়ে গেল। অত কাছ থেকে চা বাগান দেখার সৌভাগ্য আগে হয়নি। ঠিক নিচের উপত্যকায় তোর্সার এক উপনদী বয়ে চলেছে তার অজস্রধারা নিয়ে। পাশেই এক ডিসটিলারি।

ফিরে এসে কোনওমতে খাওয়া সেরেই গেলাম ওয়াচ টাওয়ারে, জীবজন্তুর জল খেতে আসা দেখতে। আমাদের জানানো হয়েছিল, ওখানে কথা বলা, দূরভাষ-চলভাষ খোলা রাখা, ফটো তোলা, ধূমপান করা নিষিদ্ধ।

আমরা এইসব বিধি যথাসাধ্য মেনে জঙ্গলের পথ ধরে গেন্ডুখোলা নদী পেরিয়ে কৃত্রিম জলাশয় পেরিয়ে টাওয়ারে উঠলাম। একটু পরেই বনবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কিছু অতিথি এসে সে স্থানে এত শোরগোল করলেন যে বোঝা গেল না তাঁরা জন্তুদের দেখতে এসেছেন না তাড়াতে এসেছেন! জঙ্গলের নিস্তব্ধ মধুর পরিবেশকে কয়েক মুহূর্তে যথাসম্ভব দূষিত আলোড়িত করে তাঁরা চলে গেলেন। তাদের পূর্ববর্তী সফল অসফল ভ্রমণ কাহিনি সারসংক্ষেপে আমাদের সমৃদ্ধ করল ঠিকই তবে রেখে গেলেন বেশ কিছু অবাঞ্ছিত বিরক্তিকর মুহূর্ত। অবশ্য রায়মাটানের সোনাখেরি লজ আর পাশের পোম্‌সে পাহাড় বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের অন্যসব না পাওয়া মুছিয়ে দিল।

বহু দিন বাদে এমন করে শুধুই জঙ্গলের পথে পথে জঙ্গলের স্বাদে গন্ধে ভরা ক'টি দিন কাটালাম কী অনাবিল শান্তি। মাথার উপরে স্বচ্ছ ঘন নীল আকাশ। আশেপাশে শুধুই অনাবিষ্কৃত সবুজ পাহাড়ের সারি। লোকালয়ের বিশেষত শহরের মালিন্যবর্জিত ঝরঝরে ঝরনা। সবকিছুই বড় মুগ্ধ করেছে। এই যে জনবিরল অজস্র পর্যটক পদস্পর্শ বঞ্চিত স্থানগুলি আমাদের বেড়ানোর জন্য খুঁজে বার করা— এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ একজনের। যাঁর নাম না করলে এই মুগ্ধতার বোধ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি হলেন তমাল গোস্বামী, সিঞ্চুলা টুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস অ্যান্ড কনসালটেন্সি সার্ভিস-এর মালিক (ফোন ৯৭৩৫০৭৫৮৩১)। সমগ্র বক্সা-তরাই অঞ্চলটির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের প্রচেষ্টায় যিনি সদাই নিরত, তাঁর ছোট্ট সঙ্গী দশ বছরের আশিস ছেত্রীকে নিয়ে।

আর কৃতজ্ঞতা জানাই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে চলার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাওয়া সেইসব মনভোলানো হাসি মুখের শিশুদের যারা আমাদের এই ভ্রমণের এক উপরি পাওনা। ফেরার পথে রেখে এলাম মেঘ পিওনের ব্যাগে সেই ছোট্ট ছেলে আশিসের জন্য মন খারাপের দিস্তা...

কন্যাকুমারী মাহিন্দ্রা

ছবি: ডা. প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলি সেই...

'এখন ডুয়ার্স'-এর জুলাই ২০১৫ সংখ্যায় লেখক সৌমেন নাগ ডুয়ার্সের সোনালি চা-বাগানের শ্রমিক আন্দোলনের কথা বিস্তারিত বলেছিলেন। ছয়ের দশকের প্রথম দিকে কিছু সময় আমার ওই বাগানে কেটেছিল। কৈশোরের সেই দিনগুলি বাগানে আমার কেমন কেটেছে তা বলতেই এই ভূমিকা।

আমার জন্ম বেতগুড়ি চা-বাগানে ১৯৪৮-এ। বাবা ওই ইংরেজ পরিচালিত বাগানে কাজ করতেন। আমি শৈশবে সাদা চামড়ার সাহেবদের চা-বাগানে ম্যানেজার দেখেছি। সেকালে ম্যানেজার ছিলেন বাগানের রাজা। বিশাল বাংলোতে থাকতেন ১০-১২ জন ঠাকুর-চাকর সমেত। আস্তাবলে দুরন্ত আরবি ঘোড়া। তাঁরা বাগান পরিদর্শনে বা অফিসে ঘোড়ায় চড়ে আসতেন। দু'-একটা জিপ গাড়ি বা ল্যান্ডরোভার গ্যারেজে। শনি-রবিবার রাতে সাহেবদের ক্লাবে বসত মেহফিল।

বাগানের প্রাইমারি স্কুলে বাবুবাড়ির বাচ্চারা ও শ্রমিক পরিবারের বাচ্চারা একসঙ্গেই পড়াশোনা করত। সামাজিক পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা শিশুকালে বন্ধু ছিলাম। বাগানের পিয়োন প্রতিদিন প্রায় ৭ কিমি দূরে মালবাজার যেত ডাকঘরে চিঠি দিতে বা বয়ে আনতে। ওর ঋজু সাইকেলটির প্রতি আমার চরম অনুরাগ ছিল।

বাগানটির মালিক ছিল ডানকান কোম্পানি। মনে হয়, ১৯৬০ সালে বাবা ওই কোম্পানির বাগরাকোট চা-বাগানের সাওগা ডিভিশনে বদলি হলেন। এর কিছুদিন আগে থেকেই পড়াশোনার কারণে মাকে নিয়ে আমরা জলপাইগুড়িতে মহুরিপাড়া ও পরে মহন্তপাড়াতে বাড়ি ভাড়া করে বাস করি। বাবা বাগানে একা। সাওগাতে রঞ্জিতকাকু ছিলেন বাগানবাবু। আর-একজন ছিলেন সমরমামা, হিসেব রাখতেন। বাবা ছিলেন ডাক্তার। ছোট একটা ডিসপেন্সারি, একজন আদিবাসী কম্পাউন্ডার, একজন দাই। বেতগুড়ির হাসপাতাল ছিল বেশ বড়।

ছুটি একটু লম্বা হলে বাগানে আসতাম। জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদীর উপর সেতু ছিল না। কাজেই বর্ষায় নদী টপকে যাতায়াত কঠিন। শিলিগুড়ি ঘুরে বাসে বাগানে যেতাম। জল কম থাকলে চরের ট্যাক্সিতে চেপে কিছুটা গিয়ে তারপর জোড়া নৌকায় মানুষ, গোরু, ঘোড়া, এমনকি ট্রাক একসঙ্গে নদী পার। একটু অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেতাম। তবে তিস্তাচরের ওই ট্যাক্সির কথা পুরনো মানুষরা এখনও নিজস্ব বৃত্তে আলোচনা করেন। এমনই রহস্যজনক ছিল তার চলাফেরা। রাস্তার ধারে বড় বড় শিরীষ আর কাঁঠাল গাছ ছিল। তিস্তা পার হয়ে এক

ছোট গঞ্জ বার্নিশ। নামটা অদ্ভুত। বার্নিশ থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে মালবাজার বা আলিপুরদুয়ারের বাস ছাড়ত।

সোনালি যেতে আমরা বাগরাকোট মোড়ে বাস থেকে নামতাম। বাগানে সরকারি বিদ্যুৎ ছিল না। নিজস্ব জেনারেটারে রাত ১১টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যেত আগের বাগানে। কিন্তু শ্রমিক পল্লিতে বিদ্যুৎ ছিল না। সে সময় তথ্য দপ্তর থেকে মাঝে মাঝে বাগানে সিনেমা দেখানো হত। আমাদের দেখা বারণ ছিল। তবে পিছনে আড়াল থেকে দু'-একবার দেখেছি। প্রত্যেক বাবুর আবাসে বড় বাগানে নানা তরকারি ফলত। গোয়ালে গোরু ছিল কয়েকটা। চা-বাগানের এক শ্রমিক গোরুগুলো মাঠে চরাতে নিয়ে যেত। বাড়িতে ছিল অঢেল দুধ। অনেক কলা গাছ ছিল।

সাওগা বাগানের বাসাতে অনেক আম-কাঁঠালের গাছ ছিল। আম হত, টক নয়, পোকা ভরতি। আমরা স্কুলের ছুটিতে বাগানে বেড়াতে আসতাম। আমার বাবার একটা ইংল্যান্ডে তৈরি হারকিউলিস সাইকেল ছিল। আমি সুযোগ পেলেই হাফ প্যাডেলে সাইকেল চালাতাম। ওইভাবে আমার মতো এক বাচ্চা ছেলের সাইকেল চালানো তখনকার সাহেব ম্যানেজারের একদম পছন্দ ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে সাইকেলে দেখলে ধমক লাগাতেন। আমাদের বাড়িতে ছিল একটা বড়সড় রেডিয়ো। উঠানে দুটো বড় বাঁশ পুঁতে তাতে তার টাঙানো হত। মাঝখানে একটা তার সংযোগ করে রেডিয়োর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত। সে সময় রেডিয়ো চালাতে ব্যাটারি লাগত এবং লাইসেন্স ফি পোস্ট অফিসে জমা দিতে হত।

সাওগা বাগানের পাশের বাড়ির তপন ও তার দাদা রঞ্জন আমার খুব বন্ধু ছিল। তবে তপনের দাদা ত্রিপুরাতে পড়াশোনার জন্য থাকত। মাঝে মাঝে ছুটিতে বাগানে আসত। সাওগাতে ছোট একটা বিমানঘাঁটি ছিল। ওখানে জামিয়ার কোম্পানির বিমান নামা-ওঠা করত। জোসেফ কার্টজু নামে এক গোয়ানিজ কেন্দ্রটির দায়িত্বে ছিলেন। উনি আমার এক প্রিয় মানুষ। বিমানে চায়ের বাক্স যেত।

কখনও দু'-একজন যাত্রীর ওঠানামা। চায়ের বাক্স বহনের কাজে ওই ঘাঁটিতে কয়েকজন বিহারি কুলি থাকত। ওরা তিস্তা নদীতে মাছ ধরত। বেশিটাই বোরোলি। দু'টাকা দরে আমাদের বাসায় বিক্রি করত। অপূর্ব তার স্বাদ। ওরা ঢোল বাজিয়ে সমবেত সুরে দেহাতি গান গাইত, রাতে। আমাদের বাসাতে তার সুর ভেসে আসত। একবার দোলের সময় এক তরুণ বিহারি ঢোলবাদক প্রচুর সিদ্ধি খেয়ে জ্ঞান হারায় এবং মারা যায়। তারপর থেকে গানের আসর জৌলুস হারায়।

চা-বাগানে তখন বিনামূল্যে বাসস্থান, চিকিৎসা, রান্নার খড়ি, তা ছাড়া স্বল্প মূল্যে রেশন, ফ্রি-তে চা-পাতি পাওয়া যেত। নিজেদের সংস্থানের পর দু'-একজন আত্মীয়-বন্ধুকে চা-পাতি দেওয়া যেত।

রাতের চা-বাগানে ছিল গা ছমছমে ভাব। গভীর সবুজ চা-গাছের ঝোপে জ্যোৎস্নাকে কখনও অশরীরী মনে হত। শ্রমিক লাইন থেকে ভেসে আসত মাদলের আওয়াজ। ডাকাতির ভয় ছিল। সাওগা বাগান ছিল এক মস্ত টিলার উপর।

টিলা থেকে বালি ভেঙে নিচে নামলে দেখা মিলত এক অনবদ্য ঝরনার। স্নিগ্ধ স্বচ্ছ অফুরান জলধারা। তারপর আধ মাইল দূরে তন্বী উচ্ছল তিস্তা। তখন তিস্তার পথ আটকে ব্যারেজ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হয়নি। বাগানের প্রায় সব মানুষের জলের প্রয়োজন মেটাত ওই ঝরনা। জলে ছোট ছোট মাছ ঘুরে বেড়াত। একবার আমার জ্যাঠামশাই বেড়াতে এসে বলেছিলেন, ওই ঝরনার জল সর্বরোগের ওষুধ। ঝরনাটা আমার খুব আপন ছিল। একবার ওর পাশে এলে ফিরতেই চাইতাম না।

একদিন দুপুরে এক বারান্দায় বসে। একটু আগে একটা ছোট সৈনিক বিমান নেমেছে ওই বন্দরে। রানওয়ে ছাড়লেই প্লেন দেখা যেত, বারান্দা থেকে। কিছু সময় পর প্লেনটা টেক অফ করল। সামনের চা-বাগানের উপর প্লেনটা কাত হয়ে বড় ছায়াগাছে ধাক্কা মেরে চা-গাছের ঝোপে আছড়ে পড়ল। আমি দৌড়ে অকুস্থলে সবার আগে। একজন পাইলট ইতিমধ্যে নেমে এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গী প্লেনে আটকে। ইতিমধ্যে কিছু মানুষ এগিয়ে এসে তাদের উদ্ধার করে বাগানের ডিসপেন্সারিতে নিয়ে এল। নিমেষের মধ্যে বাগরাকোট থেকে জিপ গাড়ি ছুটিয়ে এলেন ম্যানেজার মি. ম্যাকেঞ্জি। তাদের নিয়ে গেলেন সুচিকিৎসার জন্য। এবার উড়ে এল ফৌজি প্লেন। সিপাহিরা দুর্ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলল। দু'দিনের মধ্যে সৈনিকরা ভাঙা প্লেন তুলে নিয়ে গেল।

শ্রমিকদের ঘর তখন খড়ে ছাওয়া। সাওগাতে খড়ের এক মস্ত এলাকা ছিল। একবার ওই খড়ের বাগানে আগুন লাগে। আমরা সবাই খুব ভয় পেয়েছিলাম। অনেক দূর থেকে নাকি আগুন দেখা গিয়েছিল।

জেমি নামে আমাদের বাসায় একটা বিলিতি কুকুর ছিল। ও আমাদের সবার পায়ে পায়ে বেড়াত। রাতে বারান্দায় থাকত। শান্ত

কুকুর। ওর ঘেউ ঘেউ আওয়াজে কিছু মানুষ ভয় পেত। জাতে কুলীন ছিল। তবে দুধ-ভাত খেয়ে ও আমাদের পরিবারে আরামে থাকত। বাবা বাগানে একা ছিলেন, জেমি তাঁর সদাসঙ্গী। একবার ছুটিতে বাগানে আসব, বাগরাকোট মোড়ে বাবা এসেছেন নিয়ে যেতে। প্রথম দেখাতেই বাবা বললেন, জেমি মারা গিয়েছে। আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা পেলাম। ও আসলে বাইরে গিয়েছিল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। লেপার্ড ধরে নিয়ে যায়। বাবার দুঃখ আরও গভীর ছিল।

কিছুদিন পর আবার বাগানে গিয়ে শুনলাম, ডানকানরা সাওগা বাগান বিক্রি করে দেবে বাঙালি মালিকের কাছে। বাবাকে ডানকানরা বাগরাকোটে যেতে বলল। উনি রাজি হলেন না। থেকে গেলেন সাওগাতে। গোপালপুর টি কোম্পানি নতুন মালিক। সাওগার নতুন নাম হল সোনালি চা-বাগান।

তপনরা চলে গিয়েছিল বাগরাকোটে। নতুন বাবুরা এলেন। জানলাম তাঁদের সুযোগ-সুবিধা কিছু কম। শ্রমিকদের মধ্যেও নানা সন্দেহ দেখা দিল। আমার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হল। এদিকে বাবার শরীর খারাপের খবর পেয়ে মা ভাইবোনদের নিয়ে বাগানে গেলেন। আমি প্র্যাকটিক্যালের জন্য শহরে থেকে গেলাম। পরে এক রবিবার বাগানে যাব বলে ওদলাবাড়িতে বাস থেকে

নেমেছিলাম। হাটের দিন বাগানের ট্রাক এলে তাতে চেপে যেতে চেয়েছিলাম। হঠাৎ আমার এক কাকাকে বাগানের জিপে দেখলাম। তিনি জানালেন, বাবা খুব অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে বাগানে এসেছিলাম। বাসায় বেশ কিছু মানুষ। বাবাকে চিকিৎসার জন্য সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাবা সেখানেই মারা গেলেন। তিস্তার পারে দাহ করা হয়েছিল। আকস্মিক সব ঘটে গেল। তিস্তার শীতল জলে দাহর পর স্নান করতে গিয়ে মনে হল, বাবাকে আর দেখব না। শ্মশানযাত্রীদের শেষে একা হাঁটতে হাঁটতে বাসায় ফেরা। বাড়িতে অনেকগুলো পেট আর ছোট ভাইবোনের বয়স মাত্র চার।

তারপরও বাগানে প্রায় ছ'মাস ছিলাম। সে সময় একদিন রেশন দেওয়া চলছিল। হঠাৎ আওয়াজ ওঠে, ওজনে কম দিয়ে শ্রমিক ঠকানো হচ্ছে। যে বাবুরা রেশন দিচ্ছিলেন, তাঁরা মার খেলেন শ্রমিকদের হাতে। শান্ত বাগানে রক্ত ঝরল। আমি সাইকেল নিয়ে ছুটে যাই বিমানঘাঁটিতে। মাল থানায় ফোন করি। ঘণ্টাখানেক পর পুলিশ আসে। কেউ কিন্তু গ্রেপ্তার হয়নি।

পরে ম্যানেজারকাকু বলেন, পুলিশে জানানো ঠিক কাজ হয়নি। শুনেছি শ্রমিকরা প্রতিরোধ করত। তাই পুলিশ ফিরে গেল। এই ঘটনা হয়ত শ্রমিকদের সংগঠিত হতে সাহায্য করেছিল। তবে সোনালি বাগান একাধিকবার হাতবদল হয় এবং দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়। আসলে মালিকরা উন্নয়নের জন্য কোনও খরচ করত না। সংবাদপত্রে তখন প্রায়ই খবরে থাকত সোনালি। প্রায় ৪৭ বছর পর একদিন সোনালি বাগানে গিয়েছিলাম সে দিন। জরাগ্রস্ত মনে হয়েছিল সোনালিকে। আমাকে বা আমার বাবাকে কেউ মনে রাখেনি। তবে আমি বালি পেরিয়ে সেই ঝরনার কাছে গিয়েছিলাম সে দিন। বুঝেছিলাম, ঝরনার মন ভাল নেই। বলে এসেছি, আবার আসব, ভাল থেকো।

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী
স্কেচ: পরমেশ দাস পিন্টু

LIC
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
১২ বছরের বিশ্বস্ত নাম
Arajit Lahiri (Raja)
Zonal Manager Club Member for Agent
Contact for Free Consultancy & Servicing
- LICI Agent
- Housing Finance Ltd. Agent
- Mortgage Loan
- Premium Deposit
- NEFT Registration
- Nominee Changes
- All Type of Loan

সারা বছর আপনাদের সঙ্গে
9932103350, 9832452859
arajit45@gmail.com

প্রদীপ স্ মিল
আসাম মোড়, জলপাইগুড়ি

সব রকমের কাঠ ও কাঠের তৈরি আসবাবপত্র পাওয়া যায়। বিয়ের এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের স্পেশাল অর্ডার ও ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা আছে
7063520693/694/695

হলুদ সংকেত

ডুয়ার্সে নাকি গোটা চারেক বিধানসভায় কচুরিপানার বদলে পদ্ম ফুটবেই। অন্তত স্থানীয় পদ্ম সমর্থক নেতারা জোর গলায় তা বলে বেড়াচ্ছেন। এই সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে মোদিজি স্বয়ং একাধিক সভা করে গিয়েছেন ডুয়ার্সে। সেই সভায় মোদিজির বক্তিমের ভিডিয়ো চ্যানেলে চ্যানেলে কে না দেখেছেন? কিন্তু ভাল করে দেখেছেন কি? মানে, বক্তিমে তো উনিই ভালোই দেন। সভাতে লোকও হয়েছিল মেলা। তাই 'আসল' ব্যাপারটা চোখে না-ও পড়তে পারে বলে জিজ্ঞেস করছি। ভাল করে দেখলে নির্ঘাত দেখেছেন, মোদিজির বীরপাড়ার সভায় শ্রোতাদের আসর হলুদ পতাকায় ঝলমল করছিল। যাচ্চলে! গেরুয়া রং হলে ভাল হত না? হলদে তো গ্রেটার কোচবিহারের পতাকা। আচ্ছা, আচ্ছা! ডুয়ার্সে বিজেপি'র রং বুঝি হলদে? তাই বুঝি মোদিজি এসে 'হলুদ সংকেত' দেখালেন? বেশ কথা! তবে, ইয়ে, উনিশ তারিখের পরে লাল সংকেত যেন জারি না হয়।

ভাবার বিষয়

রায়গঞ্জ থেকে গাজোল যাওয়ার রাস্তা ৩৪ নং দুর্ঘটনা সড়ক নামে পরিচিত। কিন্তু সম্প্রতি শোনা গেল, সেই সড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যা নাকি কমে গেছে। শুনে ভাবা গেল যে, নির্ঘাত প্রশাসন উদ্যোগী হয়ে কোনও ভারী ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু দাদা, যা

শুনলেম, তাতে তো মাথাটাই আউলা হয়ে গেল! দুর্ঘটনা কমেছে নাকি অলৌকিক কৃপায়! স্বয়ং হনুমানজি আর সর্বমান্য রক্ষাকালী দেবী একজোট হয়ে দুর্ঘটনা কমিয়ে দিয়েছেন ভক্তদের আকুতি মেনে। প্রমাণ অবশ্য অকুস্থলে গেলেই হাতে গরম পেয়ে যাবেন। এই দু'জনের মন্দির বছর দুয়েক আগে স্বপ্নাদেশের কারণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই না দুর্ঘটনা কমল। এলাকার সব্বাই জানে সে কথা। মানেও। বিষয়টা ভাবার। প্রশাসনের বদলে দেবদেবীদের দায়িত্ব দিলে যদি এমন ফল মেলে, তবে ট্রাই করে দেখতেই পারেন। ডুয়ার্সে ফোর লেনের কাজ চলছে। লেনের ফাঁকে ফাঁকে মন্দির-মসজিদ-গির্জা স্থাপন করে দেওয়ার এটাই তো সুযোগ।

নয়া স্পট

সিতাই বিধানসভার আওতায় থাকা জারিধরলা গ্রামের লোকজন মোবাইল রিচার্জ করার জন্য মোগলমারিতে যান, অসুস্থ হলে ছোটেন লালমণির হাটের হাসপাতালে। এইরকম আরও কাজের জন্য সে গাঁয়ের মানুষকে বাংলাদেশেই যেতে হয় বেশি। শুধু ভোটের বেলায় সিতাই বিধানসভা। এলাকার লোকজনের মতে, ভোট দেওয়া ছাড়া দেশের মাটি তাঁদের খুব একটা কাজে লাগে না কো! ভোট এলেই জারিধরলা মাটিতে দেশের লোকেরা আসেন। ডিউটি করে পড়শি দেশের মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে বিদায় নেন। ভোট ছাড়া সে গাঁয়ে দেশের জল-বিদ্যুৎ-রাস্তা আর কিচ্ছু নেই। এবার পুজোয় ঘুরতে আসবেন?

প্রচারে বাধা, নালিশ নেই

চৈত্র মাসের শেষ পক্ষটা ডুয়ার্সের ভোটপ্রার্থীরা জোর প্রচার চালালেন। দু'-চার দিন গরম থাকলেও মোটের উপর পক্ষটা

বেশ মনোরম ছিল। কিন্তু গোলমাল হচ্ছিল অন্যখানে। সন্ধে থেকে ঘণ্টা দুয়েক হল প্রচারের হাই টাইম। এই 'টাইম'টায় মাঝে মাঝেই প্রকৃতি রেগে যাচ্ছিলেন। বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, হু হু ঝড়, ভূমিকম্প— কোনও কিছুরই অভাব ছিল না। তবে এ নিয়ে কেউ আপত্তি জানায়নি নির্বাচন কমিশনে।

আগাম সন্দেশের খবর

জঙ্গল থেকে হাতি-বাঘেরা লাগোয়া বনবস্তিগুলিতে হানা দেয় নিঃশব্দে। আগে থেকে তেনাদের আসার সন্দেশ জানা থাকলে বনবস্তির লোকজন আগাম সতর্কতা অবলম্বন করে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আগাম খবর বস্তিতে আসবে কী করে? কে পাঠাবে কাকে? ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে।

এবার একটা উপায় বেরিয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, চারপেয়েদের আগমনবার্তা জঙ্গলে থাকা কর্মী এসএমএস করে দেবে আপিসে। আপিস থেকে খবর চলে যাবে কাছের বস্তিতে এবং তারপর শাঁখ বাজিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে, উলু দিয়ে সে খবর রিলে হবে বস্তি থেকে বস্তিতে। সাধু উদ্যোগ, মানতেই হবে। পরীক্ষামূলকভাবে নতুন বাংলা বছরের শুরুতেই বক্সায় এটা চালু হতে যাচ্ছে বলে আগাম খবর। এদ্দিনে হয়ে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে স্থানীয় হস্তীকুলের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

হায়

দিদির ডাকে টলিউডের ঝাঁক ঝাঁক স্টার প্রচারে নেমে পড়ায় ডুয়ার্সের মানুষ নিশ্চিন্ত

ছিলেন যে, এবারেও ভোটের প্রচারে দু'-চারজন নায়ক-নায়িকাকে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই গুড়ে অনেকটাই বালি। বলার মতো একজনই এসেছিলেন মোটে। দেব। আরও দু'-চারজন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের ডুয়ার্সের মানুষ নাকি পর্দায় কখনও দেখেনি। তবে নেতাদের অধিকাংশ গোপনে খুশি হয়েছেন বলে রটনা। স্টার এলে খচ্চা আছে। তা ছাড়া ভোট দেবেন না এমন অনেকে সেজেগুজে এসে ভিড় জমান। দেখলে গা জ্বলে যায় গো! কম এসেছে, বেশ হয়েছে। তবুও কান পাতলে আপশোসের সুর শোনা যাচ্ছে। বিজেপি তো হেমা মালিনিকে আনতে পারত! আরে ভাই, ভোটটাই কি সব?

দুই প্রার্থী

রাজগঞ্জে এবার বিধানসভা ভোটে কী নেই? এক কথায় হরেন্দ্রনাথ রায় নেই। বিগত

খুচরো ডুয়ার্স

সাতটি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রতিবারই জমানত হারিয়েছেন। তা সত্ত্বেও 'আমরা বাঙালি'র হয়ে দাঁড়িয়ে আসছিলেন সেই ১৯৮২ থেকে। কিন্তু এবার দাঁড়াননি। আর্থিক আর পারিবারিক সমস্যার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। ইচ্ছে আছে আগামীবার। তবে হরেনবাবু না নামলেও মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো টাকা ভেঙে ভোটে নামার রিস্ক নিতে শিলিগুড়ি বিধানসভার নির্দল প্রার্থী দশরথ তির্কে দ্বিধা করেননি। প্রতীক পেয়েছেন কলম-নিব। দেখা যাক, সে কলম কী লেখে!

বারুণী

জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া মোহিত নগরের গৌরীহাটের কাছে করলা নদী উত্তরবাহী। ফলে বারুণী স্নানের দিন সেখানে দূর দূর থেকে লোক এসে ভিড় জমান। এবারেও সে স্নান ভালমতোই সম্পন্ন হয়েছে। শুধু এক চিন্তা, বাঘকে নিয়ে কিঞ্চিৎ টেনশন ছিল। পাশেই করলা ভ্যালি চা-বাগান। সেখানে তিনি বিচরণ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত বারুণী স্নানের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ দেখা না যাওয়ায় সবাই স্বস্তিতে।

রেকর্ড

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের একটা ডিভিশন হল আলিপুরদুয়ার। ডিভিশন এবার হাই ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে বলে সংবাদ। গত আর্থিক বছরে আয় করে রেকর্ড করে ফেলেছে। আয় চারশো তিরিশ কোটি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আলিপুরদুয়ারে বিজেপি শিয়োর। কারণ, তারা নির্বাচনী প্রচারে এটা বলেইনি। বিরোধীরাও কেউ তুলছে না। একেই বলে ভোটনিরপেক্ষ উন্নয়ন সংবাদ।

মমতা শাড়ি

ডুয়ার্সের গ্রামেগঞ্জে, হাটেবাজারে এই শাড়ি ভালই বিক্রি হয়েছে বলে খবর। শাড়ি সুতো বা রেশম যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন, ডিজাইন একটাই। শাড়ি জুড়ে ঘাসফুলের প্রতীক। নানা সাইজের। দাম উপরে হাজার, নিচে পাঁচশো। আইনগত কারণে এই শাড়ি পরে কেউ ভোট দিতে আসেননি। প্রচারের কালেও দলের মহিলা বাহিনীর অঙ্গে দেখা যায়নি এই শাড়ি। তবে বিক্রি হল যে? জোর খবর এই যে, বিজয় মিছিলে পরার জন্য সেসব শাড়ি নাকি আলমারিতে যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছেন ক্রেতারা। জোটপন্থীরা শুনে বলছেন, তবে আলমারিতেই থেকে যাবে।

স্ট্রবেরি

ভালই ফলছে ডুয়ার্সের রামশাই এলাকায়। বাজারে বিকাচ্ছে সাতশো টাকা কেজিতে। তুমুল চাহিদা। দেখে-শুনে আরও অনেকেই লেগে পড়েছেন চাষে। সেসব ফলন বাজারে এলেই ডুয়ার্সে বেশ সস্তায় স্ট্রবেরি মিলবে বলে আশা। বাইরের ক্রেতারাও খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন। পাহাড়-অরণ্য তো ছিলই। এবার স্ট্রবেরি এল। বেশ সুইটজারল্যান্ড-সুইটজারল্যান্ড মনে হচ্ছে কিন্তু!

টুক্রাণু

বীরপাড়ায় আবার লাল চন্দন ধরা পড়েছে। বুথে হামলার আশঙ্কায় লাটাগুড়িতে একটা হাতিকে আগাম মার্ক করে রাখা হয়েছিল। ১ বৈশাখ কোচবিহারের মদনমোহন বাড়িতে বেজায় ভিড় হয়েছিল। দিনহাটা পুরসভা

বিকেলবেলাতেও প্রত্যুষা বাজারে খুলবে। শিলিগুড়িতে জোটপ্রার্থী অশোক ভট্টাচার্যর প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হল। সিতাইতে পেল্লাই অগ্নিকাণ্ডের পর ব্লকে ব্লকে দমকল কেন্দ্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। চ্যাংড়াবান্ধায় এক নির্দল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে, কারণ প্রার্থীর বয়স ২৩। ২৫ লাগে যে!

ডুয়ার্স ব্যুরো

লাল চন্দন নীল ছবি

অরণ্য মিত্র

ডুয়ার্সের পাহাড়ি অরণ্য ঘন হলেও সেখানে শিবির বানিয়ে থাকা সোজা কথা নয়। কিন্তু পল অধিকারী ও তার শাগরেদরা অরণ্যকে ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। পরিস্থিতি লঘু হওয়ার পর জলপাইগুড়ি শহরে পল কয়েক বছর রাস্তায় চপ আর ঘুগনি বিক্রি করেছিল। পল মৃত। পুলিশের ধারণা এমন হওয়ায় সে নামও বদলে ফেলেছিল র‍্যাশন কার্ড সমেত। ওদিকে, ডার্ক ক্যালকাটা নামে এক ক্রাইম চক্র ডুয়ার্সে নতুন মাদক ম্যাজিক মাশরুমের ব্যবসা চালাচ্ছে। লাল চন্দন চালানের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যের জঙ্গি কার্যকলাপ স্পনসরও করে ওই সংস্থা। ডুয়ার্সের অন্ধকার জগতে পল অধিকারী, ডার্ক ক্যালকাটা এদেরই ভিড় বাড়ছে।

২৫

শিবিরটায় লোক থাকে পাঁচজন। পল অধিকারী বাকি চারজনের নেতা। সে আমলে কামতাপুর লিবারেশন ফ্রন্টের একজন জাঁদরেল জঙ্গি। রাজা রায় তার অধীনেই কাজ করত এক সময়। কিন্তু বর্তমানে রাজা রায় যেভাবে দাসবাবুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রসদ জোগাড় করছে, সেটা পল অধিকারীর পছন্দ নয়। তার সঙ্গে এখনও চল্লিশজন অনুগামী রয়েছে। ডুয়ার্সের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে তারা। তিন মাস অন্তর অন্তর তাদের চারজন করে এসে এই শিবিরে থাকে। এই ব্যাপারটা চলছে কয়েক বছর হল। ভুটান সীমান্তের কাছে গভীর অরণ্যে লুকিয়ে থাকা এই শিবিরটার সংবাদ অবশ্য রাজা রায়ের জানা নেই। শিবির বলতে তিনটে জংলা ছাপের তাঁবু। কিছু জামাকাপড়, শুকনো খাবার, জরুরি কিছু দ্রব্য আর অস্ত্র। একটু নিচে একটা নদী। আরও নিচে গিয়ে সেটা জয়ন্তি চা-বাগান ঘেঁষে দক্ষিণে নেমে গিয়েছে। মোবাইল টাওয়ার পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। নিচে নেমে নদী পেরিয়ে প্রায় দুর্গম অরণ্য ভেদ করে ভুটান ঘাট চলে যাওয়ার একটা গোপন পথ আছে। ভুটানি সেনারা ব্যবহার করত আগে। সে দেশে ট্রেনিং-এর সময় এই পথটা প্রথম চেনে পল অধিকারী। সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে লুকিয়ে থাকতে জানতে হয়। পল অধিকারীর এই শিবিরটা যে লুকিয়ে থাকার পক্ষে মোক্ষম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

গত তিন বছরে পল অধিকারী এই শিবির ছেড়ে কোথাও যায়নি। দলের আয় বলতে লাল চন্দনের চোরাচালানের কমিশন। জন দশেক সঙ্গী মিলে সেটা সামলায়। বাকিরা ছোটখাটো ডাকাতির বেশি কিছু করে না। কিন্তু বিনিময়ে যেটা আসছে, তাতে খেয়ে-পরে লুকিয়ে থাকা গেলেও আন্দোলন চালানো যায় না। অবশ্য হাতে এখনও যা অস্ত্র আছে, তার দাম মন্দ পাওয়া যাবে না, কিন্তু সেগুলোই তো পুঁজি। বুলেটের স্টক এই মুহূর্তে খুব কম হলেও মাস ছয়েকের মধ্যে পাঁচশো রাউন্ড হাতে আসার কথা।

এই পাহাড়ি ঘন অরণ্যে শিবির বানিয়ে থাকা সোজা ব্যাপার নয়। কিন্তু পল অধিকারী ও তার শাগরেদরা অরণ্যকে ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তবে পল অধিকারী তিন বছর ধরে এখানে নির্বাচনে আছে বিশেষ কারণে। ভারত-ভুটান যৌথ অভিযানের পর সে প্রথমে নেপাল হয়ে পালিয়েছিল উত্তরপ্রদেশে। পরিস্থিতি কিঞ্চিৎ লঘু হওয়ার পর জলপাইগুড়ি শহরে কয়েক বছর রাস্তায় চপ আর ঘুগনি বিক্রি করেছে। সেখানে সে থাকত বালাপাড়ায়। একদিন খবরের কাগজ পড়ে সে বুঝতে পেরেছিল যে, পুলিশের ধারণা হল, সে মৃত। যৌথ বাহিনীর অভিযানেই তার মৃত্যু বলে দুই দেশের পুলিশেরই অনুমান।

চক্রটার যে অংশ ডুয়ার্সে ঢুকছে, অন্ধকার জগতে তার নাম 'ডার্ক ক্যালকাটা'। কারণ পুরো নর্থ-ইস্ট এই চক্রের হয়ে যিনি সামলাচ্ছেন, তাঁর দপ্তর কলকাতায়। পুরো চক্রটা কী নামে পরিচিত তা অবশ্য জানে না পল অধিকারী। কিন্তু বুদ্ধ ব্যানার্জির সাম্রাজ্যে হাত বাড়াতে আসা ডার্ক ক্যালকাটার সঙ্গে কাজ করতেই আগ্রহ তার। লাল চন্দন চালানোর সূত্রে ওদের সঙ্গে আবছা একটা যোগাযোগ হচ্ছিল।

পল অধিকারী আর দেরি করেনি। বালাপাড়া আর আশপাশের এলাকায় বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে আসা লোকের সংখ্যাই বেশি ছিল। তারা মাথাপিছু হাজার পাঁচেক খরচা করলেই পেয়ে যেত রেশন কার্ড। পুলিশের ধারণায় নিজেকে মৃত জানার মাস দুয়েকের মধ্যেই পল অধিকারী নাম বদলে হয়ে গেল পুলিন মল্লিক। রেশন কার্ডে সে নামটাই লেখা ছিল। পরের বছর শহর লাগোয়া রাউত বাগানের কাছে একটু জমি কিনে বাঁশ-টিন দিয়ে আস্তানা বানিয়ে ফেলল পল অধিকারী। শিবিরে চলে আসার আগে কেউ যদি তার কাগজপত্র দেখতে চাইত, তবে এই ভেবে নিশ্চিত হত যে, লোকটার নাম পুলিন মল্লিক এবং সে ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক।

শিবিরে আসার আগে পল অধিকারী রাহুত বাগানের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিল। এই কয়েক বছরে বুদ্ধ ব্যানার্জির লোক কাজের প্রস্তাব দিয়েছিল কয়েকবার, কিন্তু পল অধিকারী রাজি হয়নি। দিল্লির যে চক্রটার হয়ে বুদ্ধ ব্যানার্জির কাজ করান, তার নাম 'দিল্লি এক্স'। অন্ধকার জগতের কেউ কেউ এই নামটা জানে। পল অধিকারী জেনেছিল, কারণ নিজেদের ফান্ড জোগাড় করার জন্য একদা দিল্লির আন্ডারওয়ার্ল্ডে তাকে কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু 'দিল্লি এক্স'-এর সমান্তরাল আরও যে একটা চক্র ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, সেটা সে দিল্লি থাকার সময় জেনেছিল বিশ্বস্ত সূত্রে। সেই চক্রটা ইউরোপে মুসলিম জঙ্গিদের দুবাই মারফত টাকা জোগালেও ভারতে কাজ শুরু করেছিল কোকেন আর ম্যাজিক মাশরুম দিয়ে। ম্যাজিক মাশরুম অত্যন্ত দামি নেশার দ্রব্য। এখন অবশ্য সেই সমান্তরাল চক্রটা অনেক বেশি সংগঠিত আর ব্যাপ্ত। শিবিরের জীবন শুরু করার আগে পল অধিকারী নিশ্চিত হয়েছিল এই জেনে যে, সে চক্র এবার ডুয়ার্সে ঢুকছে।

চক্রটার যে অংশ ডুয়ার্সে ঢুকছে, অন্ধকার জগতে তার নাম 'ডার্ক ক্যালকাটা'। কারণ পুরো নর্থ-ইস্ট এই চক্রের হয়ে যিনি সামলাচ্ছেন, তাঁর দপ্তর কলকাতায়। পুরো চক্রটা কী নামে পরিচিত তা অবশ্য জানে না পল অধিকারী। কিন্তু বুদ্ধ ব্যানার্জির সাম্রাজ্যে হাত বাড়াতে আসা ডার্ক ক্যালকাটার সঙ্গে কাজ করতেই আগ্রহ তার। লাল চন্দন চালানোর সূত্রে ওদের সঙ্গে আবছা একটা যোগাযোগ হচ্ছিল। চন্দনের লাইনে বুদ্ধ ব্যানার্জির দিল্লি এক্স তেমন আগ্রহী না থাকায় ডার্ক ক্যালকাটা সে লাইন প্রথমে ট্যাপ করতে শুরু করে। নর্থ-ইস্টের সাতটা রাজ্যেই জঙ্গি কার্যকলাপ ওরা স্পনসর করবে বলে পাকা খবর আছে পল অধিকারীর কাছে। তাই ওরা লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের দলে টানার কাজ শুরু করছে।

তাই টানা তিন বছর শিবিরে আত্মগোপন করে থেকে পল অধিকারী তার লোকজন মারফত ডার্ক ক্যালকাটার কাছে ক্রমশ কাছের লোক হয়ে উঠছিল। ওরা চাইছিল ভুটান সীমান্তের কাছে কোথাও একটা জায়গা, যেখানে দরকারে একটা অস্ত্রভাণ্ডার লুকিয়ে রাখা যায়। অভিজ্ঞতা থেকে পল অধিকারী বুঝেছিল যে, এমন একটা স্থান এদের প্রয়োজন হবে। অনুমান মিথ্যে হয়নি। গুপ্তাজি বলে একজন খুব শিগগির শিলিগুড়িতে আসছেন। তিনি ডার্ক ক্যালকাটার দাসবাবু।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই শিবির ছেড়ে প্রথমবার বার হবে পল অধিকারী।

২৬

চঞ্চল থাপা একটু টেনশনে পড়েছে। নীল টুপি যে একজন সুপারি কিলার, সেটা সে জেনেছে একটু আগে। অবশ্য টেনশনের কারণ সেটা নয়। সুখান লাকড়া নিশিগঞ্জ থেকে ফেরার পথে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সংক্ষেপে চঞ্চল থাপাকে নীল টুপির কাজ সম্পর্কে বুঝিয়ে দেওয়ার পর যখন সোনারপুর বাজারের কাছে টার্গেটকে দেখিয়ে দিল, তখন থেকেই চঞ্চল থাপার টেনশনের শুরু। টার্গেটের সারাদিনের যা গতিবিধি, তাতে নীল টুপিকে কাজটা সারতে হবে বাজার থেকে একটু দূরে কোনও একটা স্থানে। সেটা বড় রাস্তার উপরেই হবে। কিন্তু কাজ হয়ে যাওয়ার পর গাড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার খুব সম্ভাবনা। টার্গেটকে অন্য কোনও রাস্তায় নিয়ে যেতে পারলে ভাল হত।

কিন্তু এসব ক্ষেত্রে চঞ্চল থাপার কোনও পরামর্শ দেওয়ার অধিকার নেই। নীল টুপি অবশ্য কাজটা বোঝার পর থেকে ভুরু কুঁচকে আছে। পালিয়ে যাওয়ার পথটা আরেকটু খোলা হলে বোধহয় সেও খুশি হত। এখন দুপুর একটা। মাথাভাঙার আগে পঞ্চানন মোড়ে একটা খাবারের দোকানে বসে তিনজন পরোটা খাচ্ছিল। কাজটা কাল না পরশু হবে, সেটা স্থির না হওয়া পর্যন্ত নীল টুপি মাথাভাঙার কাছে একটা বস্তিতে থাকবে। চঞ্চল থাপাদের থাকতে হবে ফালাকাটায়।

'টার্গেটকে হিট করার প্লেসটা আমার পছন্দ নয়।'

চঞ্চল থাপাকে স্বস্তি দিয়ে হঠাৎ নিচু স্বরে কথাটা বলল নীল টুপি। সুখান লাকড়া জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ওর দিকে। দোকানে খদ্দের বলতে তারা তিনজনই।

'এইরকম সময় টার্গেট সোনারপুর বাজার থেকে বাড়িতে স্নান-খাওয়া করতে যায়।' সুখান লাকড়া ফিসফিস করে বলল, 'ডোবাটার কাছে যে প্লেসটা দেখলে, সেখানে গাড়িতে বসে থাকবে। তুমি ড্রাইভারের পাশে থাকবে। টার্গেটকে কম স্পিডে ওভারটেক করার সময় হিট করে বেরিয়ে যাব। দরকার হলে একটু ফলো করব।'

নীল টুপি কোনও কথা না বলে পরোটা চিবুতে লাগল।

'টার্গেটকে অন্য রাস্তায় নিয়ে যাওয়াটা সম্ভব নয়।' সুখান লাকড়া বোঝাতে চাইল, 'ওর সঙ্গে আমাদের আলাপ নেই। ও আমাদের চেনেও না। হাতে দিন পনেরো সময় থাকলে টার্গেটকে ফুঁসলিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে কাজটা করা যেত। তখন তো আর তোমার মতো শার্প শুটারের দরকার হত না।'

'খরচাও কম হত।' নীল টুপি একটু হাসল, 'কাজটা কি সত্যিই কাল-পরশু করতে চাও?'

'মানে?' সুখান লাকড়া অবাক হয়, 'সেটাই তো অর্ডার। পারলে আজকেই।'

'টার্গেটকে কি কেউ খুঁজে বেড়াচ্ছে? পুলিশ-টুলিশ?'

'তুমি কী বলতে চাও?' সুখান লাকড়া প্রায় নীল টুপির উপর ঝুঁকে পড়ে চাপা স্বরে বিস্ময়টা প্রকাশ করল।

'খুব সিম্পল। টার্গেটকে তোমরা নিজেরাই ফিনিশ করতে পারতে। খরচা অনেক কম হত। এর জন্য তোমাদের নিজেদেরই লোক আছে। আমি কেন?'

সুখান লাকড়া হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে

থাকল নীল টুপির দিকে। চঞ্চল থাপাও বেশ অবাক হল। তাদের লাইনে এত কৈফিয়ত চাওয়ার নিয়ম নেই। দরকারও হয় না। কাজটা শেষ করে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে, কিন্তু নীল টুপি যা বলছে তা ওদের সিলেবাসের বাইরে।

'জরুরি বলেই তোমাকে ডাকা হয়েছে।' সুখান লাকড়া স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করল এবার, 'তোমার ইচ্ছে না থাকলে এখনও বলতে পারো।'

'আমি জাস্ট জানতে চাইছিলাম।' অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরে বলল নীল টুপি, 'ছেলেটাকে তো আম আদমি বলেই মনে হল। বিপিএল কার্ড হোল্ডার বোধহয়। আমার টার্গেটদের মিনিমাম একটা গাড়ি থাকা উচিত। তবে কাজটা আজকেই হতে পারে।'

'কীভাবে?' এবার জিজ্ঞেস করল চঞ্চল থাপা নিজেই।

'সন্ধের সময়।'

'কিন্তু রোজ সন্ধেয় তো টার্গেট বাজারের দিকে আসে না!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল সুখান লাকড়া, 'আর ওই সময় রাস্তায় প্রচুর ট্রাক বেড়ে যায়। পুরো কেসটা ঝুঁকি হয়ে যাবে।'

'তোমরা খানিকটা দূরে থাকবে। আমি সাইলেন্সার গান ইউজ করব। ভিড়ের মধ্যে হিট করব। চাপ নিয়ো না। যদি আজ সন্ধেয় টার্গেট বাজারে না আসে, তবে অবশ্য কালকেই করতে হবে। কিন্তু আমার মন বলছে আসবে। চলো উঠি।'

ওরা উঠল। শেষ বিকেলের দিকে দেখা গেল, তিনজন গাড়িটা নিয়ে সোনারপুরের বেশ খানিকটা আগে একটা ধু ধু খেতের পাশে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির গতি চল্লিশের নিচে। জায়গাটা বেশ ফাঁকা। হঠাৎ হঠাৎ দুটো-একটা গাড়ি আর বাইক ছাড়া বিশেষ কিছু চোখ পড়ছিল না। নীল টুপি বলল, 'গাড়িটা দাঁড় করাও।'

চঞ্চল থাপা ব্রেক কষে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুখান লাকড়ার দিকে তাকাল।

'এখানে কাজটা সবচাইতে নিশ্চিন্তে হবে।'

'এখানে?' সুখান লাকড়া ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, 'কিন্তু টার্গেট এখানে আসবে কেন?'

'গাড়ি থেকে নামলেই বুঝবে।'

নীল টুপি কথাটা বলে গাড়ির বাইরে এল। তাকে অনুসরণ করল ওরা দু'জন।

'এটাই সেফ জায়গা। কিন্তু যদি টার্গেট এখানে না আসে, তবে...।'

কথাটা অসমাপ্ত রেখে কয়েক পা দ্রুত এগিয়ে গেল নীল টুপি। সেখান থেকে প্রায় দেড়শো মিটার দূরে অনেকটা পথ পেরিয়ে আসা এক আরোহী বাইক থামিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল হিসু করবে বলে। কিন্তু কাজটা শুরু করতে যেতেই পরপর দুটো পটকা ফাটার মতো শব্দে একটু চমকে উঠে সামনে তাকিয়ে দেখল, কেউ একজন একটা মেরুন রঙের মারুতি ভ্যানে উঠে বসল। গাড়িটা চলতে শুরু করল তারপর। কিন্তু ওগুলো কী?

আরোহী একটু ভাল করে তাকাতেই বুঝল, রাস্তার ধারে নিচের খেতের কোনায় দুটো দেহ পড়ে আছে। এর পরে সে যখন দেহ দুটোর কাছে যাবে, তখন দেখবে দুটো শরীরের কপালের ঠিক মাঝখানে একটা করে গর্ত। তা থেকে গড়িয়ে পড়ছে গাঢ় রক্ত।

২৭

পর্যটকের দলটায় থাকার কথা ছিল বাচ্চা নিয়ে তিনজন। কিন্তু চলে এসেছে পাঁচজন। অতিরিক্ত দু'জনের অবশ্য শিলিগুড়িতে থাকার জায়গা আছে। লোকনাথ রিসর্টে জায়গা না পেলে তারা অন্য প্ল্যান করবে। দীননাথ চৌহান কিন্তু তাদের হতাশ না করে বলল, 'ওয়ান মেনি রুম স্যার নো প্রবলেম। বাট কস্ট হাই।'

'কতটা হাই?' দু'জনের একজন ভুরু তুলে জানতে চাইল, 'ডুয়ার্সে কিন্তু আমরা আগেও এসেছি। গ্যাংটক, কালিম্পং— সব ঘোরা আমাদের।'

দীননাথ চৌহান আনন্দের সঙ্গে বুঝতে পারল যে, অতিরিক্ত দু'জন ডুয়ার্সে ঘোরার ব্যাপারে বেশ নবিশ। বাকি দু'জনও নিশ্চয়ই তা-ই। সে বিনয়ের সুরে দু'হাত কচলে হাসিমুখে বলল, 'সে তো আমি দেখেই বুঝলাম স্যার। বাট উই আর লোকনাথ রিসর্ট, নট কস্ট ভেরি হাই।'

'আগে বুকিং করলে তো আটশোয় পেতাম।'

'আখুন টুয়েল্‌ভ দিয়ে দেবেন।'

এর পর মিনিট বিশেক দর কষাকষির পর হাজার পঞ্চাশে রাজি হয়ে উৎফুল্ল পর্যটকরা গাড়িতে চেপে বসলেন। দিনটা মোটের উপর খারাপ কাটল না দীননাথ চৌহানের। ওদিকে একটা বিনা নোটিশের কাস্টমার তিন দিন থাকছে। এদিকেও দুটো এক্সট্রা বেশি রেটেই জুটে গেল। ফলে সে গাড়ি চালিয়ে রিসর্টে পৌঁছাবার আগেই পর্যটকদের ডুয়ার্স নিয়ে অনেক কিছু বলে ফেলল। তার পাশে যে ভদ্রলোক বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন, দেখা গেল তিনি ডুয়ার্সের অনেক ব্যাপার আগেই বন্ধুর মুখে শুনেছেন। তাই দীননাথ চৌহান যখন মালবাজারের ক্যালটেক্স মোড় অতিক্রম করতে করতে জানাল যে, সেখানে লাভা থেকে বর্ষাকালে গন্ডার নেমে আসে আর মালবাজার মিউনিসিপ্যালিটি তাদের জন্য ঘাস আর জলের ব্যবস্থা করে, তখন তিনি সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ! শুনেছি তো! এটাই সেই মালবাজার, তা-ই না?'

'ইয়েস সার। অল সিনেমা স্টার কেম হেয়ার শুটিং।'

'তা-ই নাকি? দাঁড়াও দাঁড়াও! ফোটো তুলব।'

দীননাথের গাড়ি থামাতে হয়। চারজন বড় বড় মোবাইলে খচাখচ ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর জলঢাকা ব্রিজ পার হতে হতে দীননাথ জানাল যে, ব্রিজের নিচে প্রায়ই বাঘ জল খেতে আসে। এতে একজন সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, 'এদিকে তো বাঘ নেই বলেই জানি।' সন্দেহ নেই যে, তাঁর সন্দেহটা খাঁটি ছিল, কিন্তু অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভারী গলায় দীননাথ যখন বলল, 'মিসটেক ইনফর্মেশন। চাইলে আমি গাড়ি থামাচ্ছি। আপনারা নেমে গিয়ে ওয়াচ করে আসতে পারেন। টাইগার রেগুলার কামিং আন্ডার ব্রিজ জল খেতে। ভুটানের জলে ডলোমাইট থাকে, তাই টাইগার ফ্রম ভুটান ইন জলঢাকা। এটা সবাই জানে। লেকিন ভুটানের টাইগার ইন্ডিয়াতে কাউন্টিং হবে কী করে?'

এবার সন্দেহ প্রকাশকারী নরম হয়ে বলল, 'রাইট রাইট! ভুটানের বাঘকে ইন্ডিয়া কেন সিটিজেনশিপ দেবে? আসলে ডুয়ার্স সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানি না।'

দীননাথ জোড়া ভুরু কুঁচকে মিটিমিটি হাসতে থাকে। চলতে চলতে, থামতে থামতে, ছবি-সেল্‌ফি তুলতে তুলতে পর্যটকরা এক সময় লোকনাথ রিসর্টের সামনে এসে পৌঁছায়। বাড়তি দুটো কাস্টমার দেখে গাবু সরকার লাফিয়ে ওঠেন। পর্যটকের কলকাকলিতে রিসর্টের পরিবেশ হঠাৎ হয়ে যায় মুখর। সেই মুখরতা লক্ষ করে কয়েক ঘণ্টা আগে আসা একলা পর্যটক গুটিগুটি পায়ে রিসর্টের পিছন দিকের ছোট গেট দিয়ে বেরিয়ে একটা ঢালু জমিতে এসে মোবাইল বার করে কী জানি দেখতে থাকে। তারপর ডায়াল করে কাউকে।

আধ ঘণ্টা পর দীননাথ চৌহান যখন একটু অবসর পেয়ে পিছনের ঢালু জমিতে গাবু সরকারকে লুকিয়ে একটা সিগারেট টানবে বলে একটা পাথরের উপর বসেছে, তখন সে দেখল একটা ঝোপের আড়াল থেকে একলা টুরিস্টটা বেরিয়ে আসছে। লোকটা সোজা দীননাথের দিকেই এগিয়ে এসে একটু হেসে বলল, 'আপনার তো প্রচুর চাপ দাদা! রিসর্ট তো আপনিই সামলান দেখছি!'

সহসা প্রশংসায় দীননাথ চৌহান আপ্লুত হয়ে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে পাথরটা দেখিয়ে টুরিস্টকে বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। আর ইউ সিট?'

'এই এলাকা তো তোমার পুরোটাই চেনা, তা-ই না?' টুরিস্ট দাঁড়িয়ে থেকেই প্রশ্নটা করল।

(ক্রমশ)

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

২৪

গোপাল ঘোষ তাঁর প্রতিবেশী রাধাকমলবাবুর ছেলে অমিয়কে ছোটবেলা থেকেই চেনেন। রাধাকমলবাবু জেলা দপ্তরে বড়বাবুর দুই ধাপ নিচে চাকরি করেন। তাঁর চলনে-বলনে বেশ একটা সাহেব-সাহেব ভাব আছে। অমিয় অবশ্য তেমন নয়। সে জেলা স্কুলের সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্র। তার নিজের একটা সাইকেল আছে। সেটা নিয়ে অবসর পেলেই টাউন চষে বেড়ায়। হপ্তাকয়েক আগে গোপাল ঘোষ থিয়েটার দেখবেন বলে সেজেগুজে ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলেন, অমিয় ঠিক পাশেই সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে। অমিয়কে নিত্য দেখলেও তার সঙ্গে বাক্যালাপ হয় না গোপাল ঘোষের। সে দিন কাছাকাছি পেয়ে একটু হেসে বলেছিলেন, 'কিছু বলবে অমিয়?'

'সাইকেলে ডাবল ক্যারি করলে নাকি এর পর থেকে জরিমানা দিতে হবে?' অমিয় খুব উদ্‌বেগের সঙ্গে জানতে চেয়েছিল। গোপাল ঘোষ শুনে বেশ মজা পেয়েছিলেন। এইরকম একটা প্রস্তাব শোনা গেলেও মিউনিসিপ্যালিটি কোনও কিছু জানায়নি। তবে বিপ্লবীরা তাদের যাতায়াতের জন্য সাইকেল ব্যবহার করে। এই কারণে একটা সাইকেলে দু'জন চড়ায় নিষেধাজ্ঞা আনার বিষয়টা নিয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে।

'তুমি তো একা একাই সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াও। তোমার কী চিন্তা?' গোপাল ঘোষ বললেন, 'তবে এমন কোনও নিয়মের কথা এখনও শোনা যায়নি।'

'বাবা বলছিল, এই আইনটা ইমিডিয়েট আসছে। আমি কখনও কখনও হরকে সাইকেলে চাপিয়ে টাউনের বাইরে চলে যাই। হর বলে, খোলা হাওয়ায় কাব্যশক্তি বাড়ে।'

'কাব্যশক্তি?' গোপাল ঘোষ চমকিত হন, 'তুমি কি পদ্য লেখো?'

'হরও লেখে। বাবা জানে না। বাবা আর্টিকল ছাড়া আর কিছু লিখলেই রেগে যায়। সামনেই অ্যানুয়াল এগজাম।'

'আমাকে শোনাবে তো?' বলেছিলেন গোপাল ঘোষ। অমিয় সম্মত হয়েছিল। এগজাম মিটতেই পরশু এসে শুনিয়ে গিয়েছে কবিতা। গোপাল ঘোষ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন সেসব শুনে। সেকেন্ড ক্লাসের একটা ছেলে এর মধ্যেই ছ'-সাতটা খাতা ভরতি কবিতা লিখে ফেলেছে। শুধু তা-ই নয়, রবিবাবুর লেখা লম্বা লম্বা অনেক কবিতা তার মুখস্থ। সে অতুলবাবুর মতো সরকারের উঁচু পদে চাকরি করবে আর কবিতা লিখবে। গোপাল ঘোষ শুনে অবাক হন ভিন্ন কারণে। অতুলবাবুর বাড়ি পাড়াতেই। কেরানির চাকরি করেন। সেটাকে হয়ত ছোকরা উঁচু পদ ভেবে নিয়েছে। কিন্তু তিনি তো পদ্য লেখেন না। তাই বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অতুলবাবু পদ্য লেখেন নাকি?'

'অতুলপ্রসাদ সেন।' অমিয় পুরো নামটা বলে ব্যাপারটা স্পষ্ট

‘সাইকেলে ডাবল ক্যারি করলে নাকি এর পর থেকে জরিমানা দিতে হবে?’ এইরকম একটা প্রস্তাব শোনা গেলেও মিউনিসিপ্যালিটি কোনও কিছু জানায়নি। তবে বিপ্লবীরা তাদের যাতায়াতের জন্য সাইকেল ব্যবহার করে। এই কারণে একটা সাইকেলে দু’জন চড়ায় নিষেধাজ্ঞা আনার বিষয়টা নিয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে।

করে দেয়। গোপাল ঘোষ কাব্য-নভেল না পড়লেও নামটা জানতেন। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, ‘তা-ই বলো। তা-ই বলো। তবে তোমার কবিতা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। তোমাকে এনকারেজ করা আমার কর্তব্য। তোমার সবচাইতে টাটকা পদ্যটি শোনাও তো!’

‘আজ সকালেই লিখেছি।’ অমিয় নীল রঙের একটা মাঝারি মাপের বাঁধানো খাতার পাতা ওলটায়। তারপর পয়ারের সুরে পড়ে—

‘হে পর্বত তব চূড়ার উপুরে।
নরনারী ভাত খায় বসিয়া দুপুরে।’

‘বাঃ!’ গোপাল ঘোষ আবার বিস্মিত হলেন, ‘যদিও উপুর না বলে উপর বললে ভাল শোনাত। কিন্তু মেলানোটা বেশ হয়েছে। তা কংগ্রেস নিয়ে পদ্য নেই কোনও?’

‘আছে তো।’

‘পড়ো তো!’ গোপাল ঘোষ উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসলেন। দুপুরে নিয়োগীদের বাড়িতে কংগ্রেসের সভা। গোপাল ঘোষকেও আসতে বলা হয়েছে। জুতসই একখানা কবিতা পেলে সে সভায় নিয়ে যাওয়া যায়। অমিয় সবচাইতে মোটা খাতাটা তুলে নিয়ে বলল, ‘এর অর্ধেক কবিতাই কংগ্রেস আর গান্ধিজিকে নিয়ে। হরদা বলেছে, রোজ স্বদেশি কবিতা লিখবি।’

তারপর সে পড়তে শুরু করল—

‘ওগো কংগ্রেস তুমি জাতির রতন।
ধু ধু মরুভূমি যেন বারির পতন।।
আসিয়াছে হুংকারি ব্রিটিশ যবন।
তাহার আইন ভাঙি নির্মিলে লবণ।।...’

কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। কিন্তু গোপাল ঘোষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন। অমিয় থামতেই তিনি উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, ‘ব্রেভো ব্রেভো! আমাকে কবিতাটা টুকে দাও। আজ দুপুরে কংগ্রেসের সভায় জ্যোতিকে দিয়ে পড়াব।’

সম্মানপ্রাপ্তির এইরকম সম্ভাবনা অমিয়র কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তা সত্ত্বেও সে কিঞ্চিৎ হতাশার সুরে বলল, ‘সভায় পড়লে লোকে জানবে যে আমি লিখেছি।’

‘জানা উচিত! আমি তো ভাবছি কংগ্রেস নিয়ে তোমার পদ্যগুলো এক করে একখানা বই পাবলিশ করব।’

‘সবাই জেনে যাবে যে!’

‘জানার জন্যই তো পাবলিশ করব! মুখার্জি প্রিন্টার্সের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। চা-বাগানের লেজার বুক খুব ভাল ছাপে ওরা। কবিতার বইটা লেজার বুকের সাইজের মতো করলে দারুণ হবে। কিন্তু ওতে পড়তে সুবিধা হবে না। বইতে তো একটা মলাট লাগবে, না কী?’

‘প্রচ্ছদপট?’

‘সেটা আঁকার জন্য আর্টিস্ট লাগবে না?’

‘চেনা আর্টিস্ট কেউ আছে আপনার?’

‘সুরেন আছে। সাইনবোর্ড লেখে। গান্ধির ছবি দারুণ আঁকে বুঝলে?’

‘কিন্তু লোকে যে জানবে!’

এবার গোপাল ঘোষ বেশ বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘লোকে জানলে তোমার আপত্তি কোথায় বলো তো?’

‘বাবা জেনে যাবে। সামনের বৈশাখে আমার বিয়ে। আমার শ্বশুর রামতনু মল্লিক রংপুরের স্বনামধন্য ব্যক্তি। তিনি আমাকে বিলেতে পাঠাবেন। ওঁর বড় জামাই সুরেশদা বিলেতে সিভিল সার্ভিসের ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছে। এরা কেউ কংগ্রেস আর কবিতা পছন্দ করে না। বাবার মতে, ইংরেজরা চলে গেলে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে!’

অতঃপর সমস্যাটা বুঝতে পেরেছিলেন গোপাল ঘোষ। টাউনে রাজনীতি নিয়ে উত্তেজনা প্রবল হলেও রায়বাহাদুর-খানবাহাদুর আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গর অভাব নেই। এর বাইরেও বেশ কিছু বাবু আবার সাহেব-শাসনের পক্ষে। রাধাকমলবাবুও সেই মতে বিশ্বাসী। তাই কবিতার বই ছাপিয়ে অমিয়র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ট্রেনিং নিতে যাওয়ার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতে চাইলেন না তিনি। কিন্তু অমিয়র কয়েকটি কবিতার নকল রেখে দিলেন নিজের কাছে। সে নিজের হাতে নকল করে দিয়ে বিদায় নেওয়ার সময় বলে গেল, ‘সিভিল সার্ভিসের প্রথম বেতন পেয়ে আমি কবিতার বই নিজেই পাবলিশ করব। বিলিতি অ্যান্টিক পেপারে। আপনি ফোরওয়ার্ড লিখে দেবেন তখন।’

এর পর গোপাল ঘোষের পরিকল্পনা ছিল, কবিতার নকলগুলো নিয়ে খুদিদার বাড়িতে যাবেন। হয়ত আজকালের মধ্যেই যেতেন। কিন্তু আজ দুপুরে ব্যবসার কাজ সেরে বাড়িতে ফিরে জানতে পেরেছেন, খুদিদার কাজের লোক এসে জানিয়ে গিয়েছে, তাঁর বিকেলবেলায় দেখা করতে আসার কথা। খুদিদা নিজে আসবেন— এটা গোপাল ঘোষের কাছে বেশ অপ্রত্যাশিত। ফলে তাঁর আপ্যায়নের আয়োজনে তিনি মত্ত হয়ে পড়েছিলেন। শেষে যখন নিশ্চিত হওয়া গেল যে, বাড়িতে আপ্যায়নের সম্ভাব্য সব কিছুই মজুত, তখন খানিকটা নিশ্চিত হয়ে আরামকেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে ভাবতে শুরু করলেন খুদিদার আগমনের সম্ভাব্য কারণ নিয়ে।

দুপুর প্রায় শেষের দিকে। একদল ছেলে হইহই করে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করে ফিরছিল। রাস্তার ওপাশে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে দিগেনবাবুর বাড়িতে কিছু একটা পুজো শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝেই ঘণ্টা, কাঁসর আর উলুধ্বনি ভেসে আসছিল। তিস্তা নদীর দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসছিল একটা। গোপাল ঘোষ কেদারায় গা এলিয়ে খানিকক্ষণ বিভিন্ন কারণ ভাবলেন। টাউনের নেতাদের অধিকাংশই হয় জেলে, নয়ত পলাতক। কিন্তু এই বিষয়ে কথা বলার জন্য খুদিদা কেন নিজে আসবেন?

খানিক পরেই একটা ভাবনা মাথায় আসতেই সোজা হয়ে বসলেন তিনি। এইবার ঠিক ধরতে পেরেছেন তিনি। খুদিদার মতো লোক নিজে তাঁর বাড়িতে এসে এই একটা ব্যাপারেই কথা বলতে পারেন। সেই ব্যাপারটা গোপাল ঘোষ খানিকটা অনুমান করে ফেলেছেন। বিকেল পাঁচটার একটু আগে খুদিদা যখন গোপাল ঘোষের বৈঠকখানায় জানালেন যে, তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ করতে এসেছেন, তখন বাড়ির কর্তাকে আদৌ উত্তেজিত দেখাল না। তিনি মৃদু হেসে বললেন, ‘আমার মতে একটা রাজযোটক ঘটেছে। এইবার আপনার উচিত ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা।’

‘কিন্তু ব্যাপারটা এখনই পাঁচকান করা চলবে না।’ খুদিদা বললেন।

‘আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। দরকার হলে আমি নিজেই চলে যাব মাথাভাঙায়। পাটিপত্র, আশীর্বাদ— এসব মিটলে তারপর টাউনের লোক জানবে। শোভা কি আমার মেয়ে নয়?’

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে জানালেন গোপাল ঘোষ। তাঁর বলার ভঙ্গিটা যে আন্তরিক তা অনুভব করতে পেরে ভারী ভাল লাগল খুদিদার।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
স্কেচ: সুবল সরকার

দেবপ্রসাদ রায়

৯

১৯৭১-এ আবার রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ল। তার আগে অজয় মুখার্জি আর জ্যোতি বসু আলাদা হয়ে গেলেন। বামপন্থীদের মধ্যেও একটা বিভাজনের সময় ঘনিয়ে এল। 'উলফ' এবং 'পুলফ'-এর নাম শোনা যেতে শুরু করল। অজয় মুখার্জি, বিজয় সিং নাহার, ফরওয়ার্ড ব্লক—এঁরা পুলফ-এর নেতৃত্ব দিতে শুরু করলেন। ওদিকে কেন্দ্রে তখন সংখ্যালঘু ইন্দিরাজির সরকার বামেদের সমর্থন পেয়ে ক্ষমতায়। অনেকের ধারণা, প্রথম ইউপিএ সরকারের আমলেই বামেরা কংগ্রেসকে কেন্দ্রে প্রথম সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এই কাজ তখনও একবার করেছিল বাম-দলগুলি। অবশ্য কেউ অনাস্থাও আনেনি তখন। মনে রাখতে হবে যে, সংখ্যালঘু সরকারও পাঁচ বছর টিকে যেতে পারে, যদি কেউ অনাস্থা না আনে।

কিন্তু ইন্দিরাজি '৭১-এ আবার লোকসভা নির্বাচনের ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন 'গরিবি হঠাও' স্লোগান তুলে। রাজ্যেও বিধানসভা নির্বাচনের ঘণ্টা বাজল। জলপাইগুড়ি তখন রায়গঞ্জ লোকসভার একটা অংশ। রাজগঞ্জ আর জলপাইগুড়ি পড়েছিল রায়গঞ্জের আওতায়। ইসলামপুর, করণদিঘি, রায়গঞ্জ ইত্যাদি এলাকা তখন সিদ্ধার্থবাবুর নির্বাচনক্ষেত্র। রায়গঞ্জ লোকসভায় সিদ্ধার্থবাবু দাঁড়ালেন এবং জলপাইগুড়ি বিধানসভায় আবার দলের পক্ষ থেকে কিছু প্রবীণ নেতার নাম শোনা যেতে লাগল। এবার আমরা সরাসরি বিরোধিতায় নেমে পড়লাম। আমাদের পছন্দের প্রার্থী হলেন ডাক্তার অনুপম সেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের দাবিকেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল দল। ফলে প্রার্থী অনুপমবাবুই হলেন।

ভোট করা তখন কঠিন একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের কাছে। আমি পেয়েছিলাম মণ্ডলঘাট অঞ্চলের দায়িত্ব। একটা বাড়িতে একরাত্রির বেশি থাকতে পারতাম না তখন। একই বাহনে দু'দিন পরপর চড়তাম না। সে সময় আমরা ভোট করাতে গিয়ে গাড়িঘোড়া পেতাম না বললেই চলে। '৬৮-তে তিস্তার প্রলয়ংকরী বন্যার কারণে বোয়ালমারির চরে বাঁধের কাজ চলছিল তখন। ট্রাকে ট্রাকে বোল্ডার যেত বোয়ালমারিতে। সেসব ট্রাকেই মণ্ডলঘাট যাওয়া-আসা করতাম আমরা। ট্রাক থেকে নেমে বাকি কাজ সব পায়ে হেঁটে।

এই পরিস্থিতিতে নকশালরা ভোট বয়কটের ডাক দিল। ফলে আবহাওয়া হয়ে উঠল আরও আতঙ্কের।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সেই আতঙ্ক আর সন্ত্রাসকে মানুষ ভোটের দিন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ভোট দিতে সকাল থেকেই লাইনে দাঁড়াতে শুরু করল। আমার বেশ মনে আছে যে, মোহন্তপাড়ার বুথে বোমা পড়ল। একজন ভোটার আহত হলেন, কিন্তু হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করিয়ে এসে তিনি পুনরায় ভোট দিতে লাইনে দাঁড়ালেন। ফল বেরুলে দেখা গেল, অনুপমদা পনেরো হাজারে জিতেছেন। ওদিকে আলিপুরদুয়ার থেকে নারায়ণ ভট্টাচার্য এবং কুমারগ্রাম থেকে পীযূষ মুখার্জিও জিতে গেলেন। পুনরায় অজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করে সরকার গঠন করা হল। উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন বিজয় সিং নাহার। আমরা জগদানন্দ রায়কে প্রভাবিত করে

অল্প সময়ের ব্যবধানে বিধানসভা এবং লোকসভা ভোট সম্পন্ন হয়েছিল গত শতকের সাতের দশকে। সেই সময়েই আবার ভোট বয়কটের ডাক দেয় নকশালরা। বামপন্থীদের মধ্যেও বিভাজন একই সময়। সব মিলিয়ে রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সময়টা নানা দিক থেকেই উল্লেখের দাবি রাখে। প্রধানমন্ত্রীর 'গরিবি হটাও' শ্লোগান সেও ওই সময়কার। এইরকম এক গুরুত্বপূর্ণ আবহে কেমন ছিল ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের দিন প্রতিদিন? কেমন ছিল সেখানকার সমাজ রাজনৈতিক পরিস্থিতি। রাজনীতির মানুষ সময়কে যে দলীয় রাজনীতির নিরিখে দেখবে সে তো জানা কথা। কিন্তু প্রায় ৪৫ বছর পেরিয়ে জীবন স্মৃতির পটে সেই সময়, মানুষ এমনকি রাজনীতির ঘটনাবলী যখন এক এক করে ভেসে ওঠে তখন ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি গুরুত্ব পায়।

এক কথায়, জলপাইগুড়ি শহরের চারপাশটা তখন নকশালদের মুক্তাঞ্চল। মনে রাখতে হবে যে, রাজ্যে নকশালদের ক্রিয়াকলাপ সবচাইতে বেশি যে দুটো জেলায় অনুভূত হচ্ছিল, তার একটা বীরভূম এবং দ্বিতীয়টা জলপাইগুড়ি। আমরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলাম। আমরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলাম। গোড়ায় ধারণা ছিল যে, নকশালরা মূলত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেই বিরোধে নেমেছে।

সোশালিস্ট পার্টি থেকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে এনেছিলাম। তিনিও ফালাকাটা কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে জিতে গেলেন।

এইসব রোমাঞ্চকর দিনে আমার এক পা কলকাতায় তো আরেক পা জলপাইগুড়িতে। কলকাতায় নকশালদের দাপট তখন সাংঘাতিক। বোসপাড়া, বামনপাড়া, আদরপাড়া— এসব জায়গায় লোকজন যেতে সাহস পেত না। শহরের বাইরে মণ্ডলঘাট, কাদোবাড়িতেও তাদের প্রচণ্ড দাপট। এক কথায়, জলপাইগুড়ি শহরের চারপাশটা তখন নকশালদের মুক্তাঞ্চল। মনে রাখতে হবে যে, রাজ্যে নকশালদের ক্রিয়াকলাপ সবচাইতে বেশি যে দুটো জেলায় অনুভূত হচ্ছিল, তার একটা বীরভূম এবং দ্বিতীয়টা জলপাইগুড়ি। আমরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলাম। গোড়ায় ধারণা ছিল যে, নকশালরা মূলত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেই বিরোধে নেমেছে। কমিউনিস্টরাই বোধহয় তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যেতে থাকায় বুঝতে পারলাম যে, ব্যাপারটা তা নয়। '৭১-এর নির্বাচনের আগে তিনটি বামপন্থী ভাবধারার কথা খুব শোনা যেত। ওদের ভাষায় তার একটা ছিল 'শোধনবাদী চিন্তাধারা'। এর কান্ডারি ছিল সিপিআই। 'নয়া শোধনবাদী চিন্তাধারা'র তকমা লেগেছিল সিপিআইএম-এর গায়ে। তিন নম্বর চিন্তাধারার মূল কথা ছিল 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। নকশাল আন্দোলনের গোড়ার দিকে যখন চারু মজুমদার তাঁর দলিল পেশ করেছিলেন, তখন প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমল। কিন্তু সে দলিল তখন সিপিএম দল গ্রহণ করেনি এবং নকশালবাড়িতে সোনম ওয়াংদিকে হত্যা করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেটাও বাম পরিচালিত সরকারের কোনও সহানুভূতিই পায়নি। আর দশটা হিংসাত্মক ঘটনা সামলানোর মতো করেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল যুক্তফ্রন্টের সরকার। তাই প্রাথমিকভাবে নকশালদের সঙ্গে (তখনই সিপিআই-এমএল হয়নি তারা) লড়াইটা ছিল কমিউনিস্টদের— বলতে গেলে সিপিএম-এর।

'৭১-এর নির্বাচনের পর অজয় মুখার্জি দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কংগ্রেস আবার রাজ্যে শাসকদলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে আমাদের দলও হয়ে উঠতে শুরু করল নকশালদের আক্রমণের নয়া লক্ষ্য। তাদের ব্যক্তিহত্যার নীতির কারণে কংগ্রেস কর্মীরাও খুন হতে থাকল। আমি তখন রাজ্যে যুব কংগ্রেসের সম্পাদক হয়ে গিয়েছি। জেলায় যুব কংগ্রেসের সভাপতি না হতে পারার কারণে প্রিয়দার মনে আমার বিষয়ে একটা অস্বস্তি ছিল। শেষ মুহূর্তে ভীষ্ম সভাপতি হওয়ায় পুরো স্পেসটাই চলে গিয়েছিল আলিপুরদুয়ারের হাতে। প্রিয়দা তাই চাইছিলেন আমাকে উপযুক্ত কোনও একটা জায়গায় নিয়ে যেতে।

'৭১-এ গঠিত সরকারের নাম ছিল পিপল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট বা পিডিএফ সরকার। সেটা গঠনের তিন মাসের মাথায় ইন্দোরে জাতীয় পর্যায়ে যুব কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল দীর্ঘ সময় পর। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তখন শ্যামাচরণ শুক্লা এবং ডি সঞ্জীবাইয়া ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। কর্ণাটকের তুলসীদাসাপ্পা ছিলেন যুব কংগ্রেসের জাতীয় কনভেনার। আমার বেশ মনে আছে যে, তখন লাক্ষাদ্বীপের সাংসদ পি এস সৈয়দের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম এল প্রিয়দার কাছে। সৈয়দ টেলিগ্রাম করে প্রিয়দাকে ইন্দোরে সম্মেলনে আসার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ফলে আমরা বেশ শক্তিশালী একটা দল নিয়ে গেলাম ইন্দোরে। '৭১-এর লোকসভাও হয়ে গিয়েছে তখন। রায়গঞ্জ থেকে সিদ্ধার্থশংকর রায় সাংসদ হয়েছেন। প্রিয়দাও সাংসদ হিসেবে জিতেছেন। জগদানন্দ রায় মন্ত্রী হয়েছেন পিডিএফ সরকারে।

জলপাইগুড়িতে আমরা নকশালদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠার সময় সিদ্ধার্থবাবু দিল্লিতে শিক্ষা মন্ত্রীর পদ পেয়েছেন। অনুপমদাও বিধায়ক। কিন্তু তাঁদের দাপট কমার কোনও লক্ষণই দেখছিলাম না আমরা। ফলে '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে সিআরপি নামানো হল। তারা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ক্যাম্প বানিয়ে আঠারো দিন ধরে ঝুলে থাকা লাল পতাকা নামিয়ে ফেলল। কিন্তু সিআরপি নয়, শহরে আমাদের তখন সাহস জোগাচ্ছিল শম্ভু মুখার্জি, শ্যামলগতি রায়, সুবল মজুমদার— এঁদের উদ্যোগে গঠিত 'প্রাইভেট মিলিশিয়া'। এর আগে অনুপমদার নির্বাচনের সময় আমাদের বল-ভরসা জোগানের দায়িত্ব নিয়েছিল কিছু ছেলে, যারা আমাদের চোখে কিঞ্চিৎ 'খারাপ' ছিল। এদের নেতা ছিল নিরালা হোটেলের মালিকের ছেলে গোপাল ঘোষ। গোপালের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল কংগ্রেসের হয়ে কাজে নামা এবং সেটা অবশ্যই মিঠুর সঙ্গে। ও তখন পান্ডাপাড়ার বাসিন্দা আর আমি বেশির ভাগ সময় প্রচারের কাজে যেতাম ঘুঘুডাঙা, মণ্ডলঘাটের দিকে। ওদিকে যেতে হত পান্ডাপাড়া দিয়েই। ফলে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে গোপাল উঠে পড়ত।

গোপালের সাহসের একটা নমুনা দিই। ধাপগঞ্জের হাটে সভা করব বলে মাইক ইত্যাদি লাগানোর কাজ করছি। সিপিএম-এর সুকুমার চক্রবর্তী এলেন গাড়ি নিয়ে। আমাকে দেখে বললেন, 'কী? হাট জমাতে এসেছ?'

আমি বললাম, 'আপনিও তো সে কাজেই এসেছেন।'

'তা তুমি আগে এসেছ যখন, তখন তুমিই আগে সভা করো।'

আমি আগে সভা করলাম। সভা চলাকালীন দেখলাম গোপালকে চৌহদ্দির মধ্যে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সভা শেষ করে যখন গাড়িতে উঠছি, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, সে এসে আমার পাশটিতে বসল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোথায় ছিলে? একবারও তো সভায় দেখলাম না।'

'আমি চায়ের দোকানে বইস্যা সিলাম।'

'চায়ের দোকানে কেন?'

'দ্যাখলাম সিপিএম-এর গাড়ি আইতাসে। হাটুয়া মাইর কারে কয় জানো? আমি একবার খাইসি হলদিবাড়িতে! তাই জানি।'

সাহসের এই নমুনা দেখে আমি এর পর গোপালকে একটু এড়িয়ে চলতে শুরু করলাম। একদিন হঠাৎ হইচই কাণ্ড! খোঁজ নিয়ে দেখি ইলেকশনের কাজের জন্য নেওয়া একটা জিপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং কেউ কেউ দেখেছে যে, গাড়িটাকে রাস্তায় থামিয়ে দখল করেছে গোপাল। গাড়ির ড্রাইভার ছিল হলদিবাড়ি নিবাসী এক কেরেলিয়ান। তার নাম মেনন। ওর ছেলে হলদিবাড়িতে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। তা যা-ই হোক। গাড়ি উধাওয়ের খানিক পর থানা থেকে ফোন এল। ফোনে কথা হল, 'বাঁচান! গোপাল ঘোষ প্রচুর পান করে হাসপাতালে তাণ্ডব শুরু করেছে। এর কলার ধরছে, তাঁকে গুতোচ্ছে। যাচ্ছেতাই ব্যাপার।'

(ক্রমশ)

দীক্ষা, বোরোলি মাছ, চা এবং ভোট

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

গাড়িটা ডিসিআরসি থেকে অবশেষে ছাড়ল। ভোটের কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বিস্তর ধুলো-স্নান হল। ঘেমে-নেয়ে একাকার। আরও একটা টিম যাবে গাড়িতে। তাদের জন্য অপেক্ষা। অবশেষে দুপুর গড়িয়ে গাড়ি ছাড়ল। সিটে বসতেই মনে হল, শরীর আর দিচ্ছে না। কামাখ্যাগুড়ি থেকে রওনা হলাম আমরা। শুনেছি প্রাইমারি স্কুলটা আসাম সীমান্তে। জঙ্গি-ভয়ও ভিতরে শিরশির করছে। বাকি সঙ্গীসাথিরা আসামের জঙ্গিদের কীর্তিকলাপ নিয়ে একের পর এক গল্প বলে যাচ্ছেন। যেন তাঁদেরই টাটকা অভিজ্ঞতা। আমার খুব একটা ভাল লাগছিল না। বরং মনে হল, একটু চোখ বন্ধ করি। গাড়ি ছাড়তে না ছাড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ল। কী ব্যাপার! সেক্টর অফিসার সঙ্গে যাচ্ছেন। তিনি আবার ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রর শিষ্য। যেখানে-সেখানে খান না। অনুকূল মন্দিরের সামনে তাই হল্ট। মন্দিরে তিনি প্রসাদ নেবেন! অগত্যা কী আর করা যাবে!

সেক্টরবাবু পরিতৃপ্তি করে খেলেন। আমরা পালা করে সাদা ধবধবে মন্দিরটি ঘুরে দেখলাম। তারপর গাড়ি আবার চলল। সুটেড-বুটেড সেক্টরবাবু গর্বভরে বললেন, আমি নিরামিষ খাই!

আমরা আমিষাশীরা চুপচাপ শুনলাম। তাঁকে খেপানো যাবে না। আসাম সীমানার অজ গ্রামে যাচ্ছি। জঙ্গি-হাত থেকে বাঁচালে তিনিই বাঁচাবেন। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ। সেই ডুয়ার্স। সেই অদ্ভুত সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ। পড়ন্ত দুপুরের বিশ্রাম জড়িয়ে খেতগুলো শুয়ে আছে। সরু পথ মাঝে মাঝে চলে গিয়েছে নিরুদ্দেশে। সবুজে চোখ ডুবতে ডুবতে কখন যেন বুজেও এসেছিল। হঠাৎ গাড়ি থেমে পড়তে তন্দ্রা কাটল। সেক্টর অফিসার হাঁক পাড়ছেন, সবাই নামুন। জিনিসপত্র নামান।

—চলে এলাম?

—না, না। এবার নদী পেরতে হবে। একটা দ্বীপের মতো গ্রামে যাব আমরা। এবার নৌকোয় উঠতে হবে।

এতদিন পর নদীটির নাম মনে নেই। সংকোশের কোনও শাখানদী বা উপনদী হবে হয়ত।

নৌকোয় উঠে বেশ লাগল। হু-হু হাওয়া। নদীর শুদ্ধ বাতাস যেন আমাদের স্নান করিয়ে দিল। সঙ্গী এক ভোটকর্মী দরাজ গলায় ভাটিয়ালি ধরলেন, 'কূলকিনারা নাই রে নদীর...'। নৌকোর খোলে ইভিএম মেশিন, টোপলাটাপলি! দূরে দূরে গাছপালা ঢাকা গ্রাম।

নৌকো ঘাটে ভিড়ল। —এসে গিয়েছি?

সেক্টরবাবু বললেন, না, না, আরও অনেকটা যেতে হবে। আপনি জিনিসপত্র নিয়ে ওই ঠেলাগাড়িটায় বসুন। বাকিদের হাঁটতে হবে। হাতে ঠেলা ঠেলাগাড়ি, তাতে বসব!! এমন অভিজ্ঞতা হবে কল্পনা করেছিলাম কোনও দিন? বললাম, না না, আমিও হাঁটছি। জিনিসপত্রগুলো ঠেলায় যাক। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তবে লক্ষ রাখবেন, পড়ে যেন না যায়।

দু'পাশে পাটখেত, সরু রাস্তায় আমরা চলেছি।

অনেকটা পথ হেঁটে অবশেষে আমাদের ভোটগ্রহণকেন্দ্রে পৌঁছানো গেল! ছোট্ট একটি প্রাইমারি স্কুল।

আমার বেশ লাগছিল। স্কুলঘরের জানলা খুলেই অবাক। চার হাত দূরেই বিশাল সংকোশ নদী। কুলকুল জল। তীব্র স্রোত। ওয়াটার-ক্যারিয়ার বললেন, নদীর ওপারেই আসাম। খুব গণ্ডগোল চলছে। ধরপাকড় বাড়লেই জঙ্গিরা আমাদের এইসব দ্বীপগ্রামে আস্তানা গাড়ে। তবে ভয় পাবেন না। আধাসামরিক বাহিনী আসবে।

সে ঠিক আছে। ভয় থাক। একটু নদীকে দেখে নিই।

—রাতে কী খাবেন বাবু? আমার বাড়িতেই রান্না হয়। একজন বয়স্ক মানুষ জানতে চাইলেন।

বললাম, এই সংকোশের ছোট মাছ খাওয়াতে পারবেন?

—আজ হবে না। কাল ভোরে ধরব। কাল হবে। আজ ডিম-ভাত করি? দেশি মুরগির ডিম? আমার বাড়িরই।

ইচ্ছে করছিল ঘুরে বেড়াই। কিন্তু উপায় কই! কত কাগজপত্র তৈরি করতে হবে।

হাত-মুখ ধুয়ে কাগজপত্র নিয়ে বসতেই সেক্টরবাবুর গলা, আপনারা থাকুন, আমি একটু ঘুরে আসছি?

—কোথায় যাচ্ছেন? বলে পিছনে তাকাতেই অবাক! তাঁকে চেনা যাচ্ছে না। কোথায় সুট-বুট-ব্র্যান্ডেড শার্ট? ধুতি-পাঞ্জাবি-হাওয়াই চটিতে একেবারে অন্যরকম।

আমার সীমাহীন বিস্ময়-চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। —সারপ্রাইজড হচ্ছেন? এ আমার অন্য জীবন। আপনারা কাজ করুন, আমি একটু অন্য কাজ সেরে আসি।

আমি অবাক হয়েই বললাম, বুঝলাম না দাদা।

—আরে, অবাক হবার কিছু নেই। ক'টা দীক্ষা দিয়ে আসব। আমি ঠাকুরের ঋত্বিক। আমার তো এখন কাজ নেই। আগে বলে রেখেছিলাম। মনে হয় বেশ কিছু হয়ে যাবে। যাই?

ঘাড় নাড়লাম। আমার আর বলারই বা কী আছে? ভোট আর দীক্ষা— তালগোল

> ডুয়ার্সের ভোট এমন কত স্মৃতি এনে দিয়েছে। মনে হয়, একবার সেসব অভিজ্ঞতা জড়ো করেই একটা আস্ত বই লিখব। চামুর্চির পথে এক চা-বাগানে সেবার ভোট নিতে যাওয়া, সারাদিন খাবারদাবার জোটেনি। এক কাপ চা-ও নয়। ভোটশেষে চায়ের পিপাসায় ছটফট! না পেরে এক কোয়ার্টারের বন্ধ দরজায় কড়া নাড়লাম। দরজা খুলে সদ্য ভোটার তরুণীটি অবাক! এই ভোটবাবুদের কাছেই তো আজ ভোট দিতে গিয়েছিল সে। জীবনের প্রথম ভোট। তার বাড়িতে কেন তারা?

পাকিয়ে গিয়েছিল আমার ভিতরে।

লণ্ঠন জ্বাললাম। গ্রামে বিদ্যুৎ ঢোকেনি। টিমটিমে আলোয় কাজ শুরু করলাম। আমার সঙ্গীরা গ্রাম দেখতে গিয়েছে। এমন গ্রাম তারা আগে দেখেনি তো। মনে হচ্ছে আন্দামানে আছি। অথচ ডুয়ার্স।

তিনি ফিরলেন রাত এগারোটায়। মুখে তৃপ্তির হাসি। যেন গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ নাম তুলে ফিরলেন!

—জানেন, মার্ভেলাস ব্যাপার! ভাবিনি এতজন হবে। এতগুলো পরিবার! প্রচুর দীক্ষা দিলাম। লোকগুলো অদ্ভুত সরল। আমাকে তো ছাড়তেই চায় না। ঠাকুরের কথা বললাম, সব মুগ্ধ হয়ে শুনল। একটা কাজের কাজ হল মশাই!!

আমি আর কী বলব। কাগজপত্র সামলাতেই ঘামছি। —খাবেন না?

—আর বলবেন না, প্রচুর খাওয়া হয়ে গিয়েছে। পারেও লোকগুলো। যেন দেবতা বনে গিয়েছিলাম। দক্ষিণাও কম জুটল না। আপনারা খেয়েছেন তো?

বাকিরা মশারি খাটিয়েছে। নাক ডাকার আওয়াজ গাঢ় হচ্ছে। আমি ইভিএম পাশে নিয়ে কাগজ সাজিয়েই চলেছি। তিনিও ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে এবার রঙিন ট্র্যাকসুট পরেছেন, সেন্টের ফুরফুরে গন্ধে ঘর ভরে গিয়েছে। এক সময় তিনিও ঘুমালেন।

আমি মধ্যরাতের সংকোশের আওয়াজ শুনছি। ভয় কাটিয়ে জানালা খুললাম। জ্যোৎস্না গায়ে মেখে নদী বইছে। কী অসাধারণ রূপ! মনে হল তার সঙ্গে কথা বলি, যাকে বলে আনন্দ পাব। হয়ত সে আমার একটি ফোনের অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে এখন ঘুমাচ্ছে! কিন্তু এখানে তো মোবাইল টাওয়ার নেই!

রাত দশটা নাগাদ খবর পেয়েছি, আধাসামরিক বাহিনী নদীর ওপার থেকে ঘুরে গিয়েছে। নৌকোর অভাবে নদী পেরতে পারেনি। আর আসবে বলে আশাও নেই।

এত রাতে সংকোশের দিকে তাকিয়ে একবারও ভয় হল না, একবারও জঙ্গিদের কথা মনে হল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়েই রইলাম।

ভোররাতে উঠে সংকোশের জলে স্নান সারলাম। সারা শরীরে শান্তি ছড়িয়ে পড়ল। দেখলাম নদীতে আমাদের জন্য মাছ ধরা হচ্ছে। বললাম, পেলে কিছু?

—বোরোলি গো বোরোলি। অনেক। ভোটবাবুদের জন্য আজ তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছে!

কাজকর্ম শুরু হল। এক সময় মক পোলও হয়ে গেল। একজন বললেন, জানলা দিয়ে একটু নদীর দিকে তাকান!

সত্যিই দারুণ! নৌকোয় করে নানান দিক থেকে ভোটাররা আসছেন।

কোনও জঙ্গি আসেনি। আশি শতাংশের উপর পোল হল। গ্রামের লোকগুলো কতবার খোঁজ নিয়েছে— খেয়েছি কি না, জল লাগবে কি না।

শেষে সব গুটিয়ে ফেরার পালা।

প্রবীণ মানুষটি বারান্দায় বসে আছেন।

—বহু কষ্ট করেছি জানেন। গরিব না হলে কেউ এই বিজনে বাসা বাঁধে? তবু জানতাম কোনও দিন সুদিন আসবে। আসবে হয়ত। বিদ্যুৎ আসেনি। স্কুল বলতে এইটাই। প্রাইমারি। হাই স্কুল যেতে হয় নদী পেরিয়ে। বর্ষায় অসম্ভব প্রায়। কলেজ তো স্বপ্ন। কয়জন পৌঁছাতে পারে বলুন? কঠিন রোগ হলে বাঁচার আশা নেই। জলপাইগুড়ি শহর যেতে হলে গোটা দিন চলে যায়।

এত বছর পরেও সেই বুড়োর কথাগুলো কানে ভাসে। হয়ত গ্রামটিতে এখন বিদ্যুৎ এসেছে, সিরিয়ালের আওয়াজে সন্ধ্যা গমগম করে। মোবাইল টাওয়ার বসেছে। হয়ত আরও অনেক কিছুই হয়েছে। কিংবা কিছুই হয়নি ডুয়ার্সের আরও অনেক এলাকার মতোই।

ডুয়ার্সের ভোট এমন কত স্মৃতি এনে দিয়েছে। মনে হয়, একবার সেসব অভিজ্ঞতা জড়ো করেই একটা আস্ত বই লিখব। চামুর্চির পথে এক চা-বাগানে সেবার ভোট নিতে যাওয়া, সারাদিন খাবারদাবার জোটেনি। এক কাপ চা-ও নয়। ভোটশেষে চায়ের পিপাসায় ছটফট! না পেরে এক কোয়ার্টারের বন্ধ দরজায় কড়া নাড়লাম। দরজা খুলে সদ্য ভোটার তরুণীটি অবাক! এই ভোটবাবুদের কাছেই তো আজ ভোট দিতে গিয়েছিল সে। জীবনের প্রথম ভোট। তার বাড়িতে কেন তারা?

আমি বললাম, মা-বাবা কেউ বাড়িতে আছেন?

সে চেঁচিয়ে ডাকল, মা!

ভদ্রমহিলা এলেন। আমি হেসে বললাম, একটু চা খাওয়াবেন আমাদের? সারাদিন চা জোটেনি, চা-বাগান থেকে চা না খেয়ে গেলে আপনাদেরই অসম্মান করা হবে। তাই কড়া নাড়লাম।

হি-হি-হি করে হেসে উঠল মা ও মেয়ে। যোগ দিলেন গৃহকর্তাও।

জানি না সে চায়ে আলাদা কী ছিল। কিন্তু প্রায় দেড় দশক পেরিয়েও সেই ভোটের চায়ের কথা আমি ভুলতে পারি না।

এখন বন্ধ চা-বাগানটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে মন খারাপ হয়ে যায়। ওদের কথা মনে পড়ে। জানি না ওরা কোথায়। কিন্তু সেই কবে, কতকাল আগে আমাকে দিয়ে গিয়েছে এক শাশ্বত চায়ের কাপ!

পথিক বর

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা

এখন ডুয়ার্স-এর উদ্যোগে এরকমই একটি অভূতপূর্ব সংকলন প্রকাশিত হবে আগামী জুন মাসে। এই অঞ্চলের খ্যাত-অখ্যাত কবিদের নিজস্ব বাছাই কবিতাগুচ্ছ থাকছে এই সংকলনে। স্বভাবতই কলেবরে আয়তনে দশাসই হবে বলাই বাহুল্য। ডুয়ার্সের যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের সবার কাছে আহ্বান রইল এই সংকলনে কবিতা সহ যোগ দেওয়ার। কবিতায় ডুয়ার্স ভূখণ্ডের উপস্থিতি কাম্য। প্রত্যেকে তাঁর সেরা কুড়িটি কবিতা (প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত) বাছাই করে টাইপ করে পিডিএফ ফরম্যাটে মেল করুন ekhonduars.sahitya @gmail.com কিংবা হাতে বা ডাকযোগে হলে পাঠান 'এখন ডুয়ার্স'-এর ডুয়ার্স ব্যুরো অফিসে। (মুক্তাভবন। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি) আরও কিছু জানতে চাইলে ফোন করুন অমিতকে (৯৬৪৭৭৮০৭৯২) বা শুভ্রকে (৯৪৭৫৫০৩৩৪৮)। কবিতা পাঠাবার শেষ তারিখ মে ১৫, ২০১৬।

রেমিকার অনুবাদেই নেপালি ভাষায় প্রথম গীতাঞ্জলি পাঠ

সারা বিশ্বের বহু ভাষায় অনুবাদ হলেও নেপালি ভাষায় গীতাঞ্জলি ছিল না তখন পর্যন্ত। তাঁর হাতেই প্রথম সেই কাজটি সম্পন্ন হয়।

সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রানুরাগীরা বিভিন্নভাবে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সিকিম অ্যাকাডেমি উদ্যোগ নেয় গীতাঞ্জলিকে নেপালি ভাষায় অনুবাদ করতে। মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রেমিকা থাপার সঙ্গে এ বিষয়ে অ্যাকাডেমি যোগাযোগ করলে রবীন্দ্রানুরাগী রেমিকা ওই কাজে উৎসাহ দেখান। কিন্তু এর পরই তাঁকে একটা বিরাট সমস্যার সামনে পড়তে হয়। তিনি যে বাংলা ভাষাটাই জানেন না! আর ভাষা না জেনে মূল কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ তিনি করবেন কীভাবে? সেই তাগিদ থেকেই বাংলা শেখা শুরু। উৎসাহী রেমিকার বাংলা হরফ লিখতে ও পড়তে বেশি দিন সময় লাগল না। সংসার, অধ্যাপনা সামলে তিনি নিজেকে যোগ্য করে তুললেন গীতাঞ্জলি অনুবাদের জন্য।

রেমিকা থাপার জন্ম রবীন্দ্র-স্মৃতিধন্য কালিম্পঙের মংপুতে নেপালি পরিবারে। মেয়েবেলার দিনগুলো কেটেছে পাহাড়-ঘেরা সেই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে। পড়াশোনার শুরু সেখানেই। সরস্বতী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, তারপর দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক ও নেপালি ভাষায় স্নাতক হন তিনি। এর পর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। ওই সময় বাংলা কথা অল্পস্বল্প বুঝতে শিখেছিলেন রেমিকা তাঁর বাঙালি বন্ধুদের সান্নিধ্যে, ভাঙা ভাঙা বলতেও পারতেন।

স্কুলে পড়াকালীন পাঠ্যপুস্তকের দৌলতে দু'-একটি রবীন্দ্র-কবিতার সঙ্গে পরিচয়। মংপু রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় স্থান, যার নিদর্শন আজও রয়েছে। সেখানে বেড়ে ওঠায় রবীন্দ্রনাথকে ছোট থেকেই জেনেছিলেন তিনি। এর পর মালবাজার কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে শিলিগুড়িতে থাকতে শুরু করেন। ফলে বাংলা ভাষার আরও কাছাকাছি আসেন তিনি। কিন্তু যখন গীতাঞ্জলি অনুবাদের কাজে হাত দিতে গেলেন, তখনই বাংলা ভাষাটি ঠিকমতো জানার ও শেখার গুরুত্ব অনুভব করলেন তিনি।

রেমিকা থাপার কথায়, 'এমনিতেই অনুবাদ মোটেই সহজ নয়। তার উপর রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি। আমি কখনও চাইনি ইংরেজি অনুবাদ থেকে নেপালি ভাষায় অনুবাদ করতে। তাতে কবিতার প্রতি সঠিক বিচার হত না। মূল কবিতা থেকেই আমি অনুবাদ করতে চেয়েছি। তাই নিজের চেষ্টায়, সহকর্মীদের সহযোগিতায় আর অবশ্যই কম্পিউটারের সাহায্যে বাংলা ভাষা লিখতে-পড়তে শিখে নিই। তারপর গীতাঞ্জলি অনুবাদের কাজে হাত দিই।' ২০০৮ সালে অনুবাদের কাজ শুরু করেন তিনি। ১৫৭টি কবিতাই নেপালিতে অনুবাদ করেন। শেষ হয় ২০১০ সালে। সিকিম অ্যাকাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় গীতাঞ্জলির নেপালি অনুবাদ। সেটা ছিল গীতাঞ্জলি রচনার শতবর্ষপূর্তি।

কবিতাগুলির মূল ভাবকে বজায় রেখে রেমিকা থাপা তাঁর অনুবাদকে কতখানি রসোত্তীর্ণ করতে পেরেছেন, সে তো নেপালিভাষী পাঠকই বলবেন। শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা কিংবা সাহিত্যের প্রতি চূড়ান্ত টান থাকলেই এ কাজ সম্ভব নয়। একজন অবাঙালি বাংলা ভাষাকে একান্তভাবে আপন করে নিতে পারলে তবেই পাঠক হৃদয় জয় করা যেতে পারে। তাঁর এই অনুবাদকর্মে রবীন্দ্রানুরাগীরা যে খুশি তা বলাই যায়।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

নারীর অধিকার শুধুই আইনি?

অর্ধেক নয়, একটাই আকাশ আমাদের। নারী-পুরুষের সব্বার। আকাশের যেমন সীমানা নেই, জল-মাটি-হাওয়ার ভাগীদারিতে নারী-পুরুষ-ভেন্ন হবে কেন? প্রকৃতি যে নারীর রূপ সেকথা তো পুরুষই বলেছে। জল-আলো-বাতাসের ভাগ পুরুষ পাবে না একথা তো নারী বলে না। তবে খামোখা কেন পুরুষ প্রকৃতির পরশে লালিত হয়ে নিজেদের অক্ষমতা আড়াল করতে যুগ-যুগান্ত ধরে সময় অপচয় করে। নারী বা পুরুষ তার নিজস্ব সত্তা বাদ দিয়ে কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তবু অনেকেই ভাগাভাগির বিশ্বাস আঁকড়ে তত্ত্ব-তথ্যের ভার বাড়িয়ে চলেন। বিভাজন প্রকট বলেই কি নারী ধর্ষিতা হলে দৈনিকের শিরোনাম যতখানি জায়গা পায় নারীর সাফল্য বার্তায় ততটুকু আলোড়ন ওঠে না? সাম্যের যে অধিকার সেখানেই লিঙ্গ বৈষম্য। তার থেকে বেরিয়ে এসে বোধদয়ে এবং অভ্যাসে কার্যকরী হওয়াটা এখনও অনেকটা বাকি। সংবিধান সমানাধিকারের কথা বলে। প্রকল্প-পরিকল্পনাও বলে। কিন্তু তা কেবলমাত্র ভাষায়। বাস্তবে তা অর্জিত হওয়া উভয়ের সংগ্রাম।

এনজয় করো কিন্তু তাই বলে মাত্রাতিরিক্ত নয়

প্রঃ- কিছু কিছু কাজ আছে অথবা এমন কিছু ব্যাপার আছে, যা করতে আমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু বাবা-মা সেসব অ্যালাও করতে চাইছেন না। তাঁদের ধারণা, বিষয়গুলো ইউজলেস। নিছক সময় নষ্ট। অথচ আমার কাছে সেসব এনজয়েবল। সব সময় নিজের পছন্দের কাজে বাধা পেতে আমার ভাল লাগছে না। আমি কী করব?

অতৃষা কর, দশম শ্রেণি

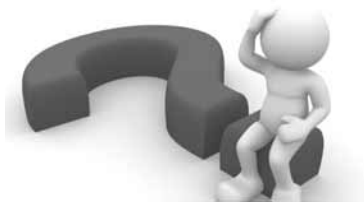

উঃ- কোন ধরনের কাজ অথবা কী ধরনের ব্যাপার, নির্দিষ্ট করে তুমি কিছু বলোনি। নির্দিষ্টভাবে বিষয় জানতে পারলে আলোচনার সুবিধে হয়। তবে যেহেতু তুমি ছোট, তাই তোমার কিছু পছন্দের বিষয়কে আমি আন্দাজ করে নিচ্ছি। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট অ্যাভেল করা, বন্ধুদের নিয়ে প্রচুর হইচই, টিভি সিরিয়াল, জন্মদিন পালন করতে চাও কোনও হোটেলে ইত্যাদি। যদি এমন হয় তাহলে প্রথমেই তোমাকে বলি, এর কোনওটিই ক্রিমিনাল অফেন্স নয়। প্রযুক্তির ব্যবহার তুমি নিশ্চয়ই করতে পারো।

তাহলে মা-বাবা বাধা দিচ্ছেন কেন? তোমাকে ভাবতে হবে, যা যা কিছু তুমি করতে চাইছ, তাতে তোমার একান্ত কর্তব্য বা করণীয় কাজগুলো ব্যাহত হচ্ছে কি না। তুমি যদি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, হাইক— এসবের নেশায় মশগুল হয়ে যাও, যদি দিনের অনেকটা সময় এসবের মধ্যেই কাটিয়ে ফেলো তাহলে সে ধরনের এনজয়মেন্ট তোমার জীবন গঠনের পক্ষে কতটুকু ইউজফুল! কেবলমাত্র তোমার ভাল লাগছে বলে একের পর এক টিভি সিরিয়াল যদি তুমি দেখতেই থাকো তাহলে এমন নিছক ভাল লাগাকে প্রশ্রয় দেওয়া তোমার নিজেরই উচিত কি না! বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব, হইচই, আড্ডা— এসবের প্রয়োজন আছে। জীবনে নির্মল আনন্দের নিশ্চয়ই কিছু মূল্য আছে। কিন্তু নিছক আড্ডা অথবা হইচইয়ের রেশ তোমরা ছোট বলেই অনেকটা সময় ধরে তোমাদের ভিতরে থেকে যায় এবং যে কনস্ট্রাকটিভ কাজগুলো তোমার করণীয়, সেসব তখন ঠিকমতো করা হয়ে ওঠে না। অতিরিক্ত যা কিছু, তাতে সাময়িক এনজয়মেন্ট থাকলেও তা খানিক দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

মধুপর্ণা রায়

শ্রীমতী ডুয়ার্সে এ মাস থেকে একটি নিয়মিত বিভাগ শুরু হল 'প্রশ্ন-উত্তর ডট কম'। আপনাদের যে কোনওরকম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সমাধানের উত্তর দেবেন মধুপর্ণা রায়, শিক্ষিকা, সুনীতিবালা চন্দ সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি। চাইলে প্রশ্নকর্তার পরিচয় গোপন রাখা হবে। প্রশ্ন পাঠান 'এখন ডুয়ার্স' দপ্তরে।

শিশুদের নিয়মিত দাঁতের যত্ন অত্যন্ত জরুরি

কিছু ডাক্তারি পরামর্শ

আগের দুটো সংখ্যায় বাচ্চাদের দাঁতের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজকের সংখ্যার আলোচ্য বিষয় হল—

১) দাঁতে দাঁত না ওঠা— বাচ্চাদের সাধারণত ৬ মাস থেকে ২ বছরের মধ্যে সব দাঁত উঠে আসে। যদি এর মধ্যে দাঁত না ওঠে তাহলে বাচ্চার মাড়ির একটা এক্স-রে করানো প্রয়োজন এবং ডাক্তার দেখানো দরকার।

২) এলোমেলো দাঁত ওঠা— বাচ্চাদের ৬ বছর বয়সে যখন স্থায়ী দাঁত ওঠে, তখন অনেক সময় দেখা যায়, দাঁত একটার উপর একটা উঠছে বা এলোমেলো উঠছে বা নতুন দাঁত পুরনো দাঁতের পিছনে উঠছে। সে ক্ষেত্রে পুরনো দুধের দাঁত তুলে নতুন দাঁতের জায়গা করে দিতে হবে। চোয়াল উঁচু থাকলে বা দাঁত বাইরের দিকে বেরনো থাকলে ডেন্টিনেশন দেখাতে হবে।

৩) Cleft lip & cleft palate— এটি জন্মগত। শিশুর লিপ ও প্যালেট চেরা থাকে। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে ঠোঁট ও তালু খুব সুন্দরভাবে ঠিক করে দেওয়া যায়। কাজেই কোনও বাচ্চার যদি জন্মগত এই ত্রুটি থাকে তাহলে দেরি না করে জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

৪) দুর্ঘটনায় দাঁত ভেঙে যাওয়া— খেলতে গিয়ে বাচ্চাদের দাঁত ভেঙে যাওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা। এই ক্ষেত্রে ভাঙা দাঁত পুরোটাই সুন্দর করে দেওয়া সম্ভব। এমনকি যদি দাঁত পুরো বেরিয়ে চলে আসে, সে ক্ষেত্রে ২০ মিনিটের মধ্যে ডেন্টিস্টের কাছে পৌঁছালে সেই দাঁত আবার প্রতিস্থাপন করাও সম্ভব।

বাচ্চাদের দু'বেলা দাঁত ব্রাশ করানোর অভ্যাস করা, যে কোনও খাবার খেলে কুলকুচি করা— এসব ছোট থেকেই শেখানো প্রয়োজন। খাবার চিবিয়ে খাওয়া শেখান। তবেই তাদের মুখের স্বাস্থ্য ভালো হবে।

ডা. পায়েল আগরওয়াল চক্রবর্তী

পাহাড় নদী চা বাগান নিয়ে এই বেশ ভাল আছি

এই পাহাড় অরণ্য চা-বাগান ঝরনা ঘেরা মালবাজার শহরে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলাম। প্রকৃতির বড় কাছাকাছি আছি আমি। পৃথিবীর অনেক জায়গা বেড়াতে গিয়েও মনে হয়েছে, এই ডুয়ার্স বেশি সুন্দর আর অনেক বেশি সবুজ ও সজীব। আর এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়।

শৈশবটা কেটেছিল পাহাড়ে। ঝালং, পেরেন, বিন্দু ভেসে ওঠে শৈশবের স্মৃতিতে। বাবার চাকরিসূত্রে বহুদিন ছিলাম জলঢাকায়। ডব্লিউবিএসইবি কোয়ার্টারের বারান্দা থেকে সামনের পাহাড়ের দিকে তাকালে কত কী যে মনে হত! সেই ছোট্টবেলায় 'ডাকঘর'-এর অমলের মতো কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠত মন। কল্পনায় ছবি আঁকতাম নিজের মনের সঙ্গে। কথা বলতাম ওই জঙ্গল-পাহাড়-নদীর সঙ্গে। হাজার দুষ্টুমি করলেও ওই পাহাড়ের দিকে তাকালেই শান্ত হয়ে যেতাম। ঝালঙের ওই বড় মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে চারদিকের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, কী আছে ওই পাহাড়ের ওপারে।

শীতকালে কমলালেবুর গন্ধে একটা অদ্ভুত আবেশে ভরে যেত প্রাণ। এইভাবেই ঝালঙের প্রাইমারি স্কুলে পড়তে পড়তে চলে এলাম কোচবিহার আর তারপর জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ির সেন্ট্রাল গার্লস-এ নবম শ্রেণিতে ভরতি হলাম। জন্ম এই শহরেই, তাই শহরের প্রতি একটা নাড়ির টান অনুভব করতাম। তিস্তা নদীর বাঁধ দিয়ে হেঁটে যেতে ভীষণ ভাল লাগত। নদীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে হারিয়ে যেতাম। দূরে নৌকো ভাসতে দেখলে মনে হত, চলে যাই ওই দূরে, যেখানে নীল আকাশ আর নদী মিলেমিশে গিয়েছে।

স্কুল ছুটি হলেই চলে যেতাম বাবার কাছে। তখন বাবা পেরেনের কোয়ার্টারে। সারারাত শুয়ে শুয়ে শুনতাম মাথার কাছেই পাহাড়ের উপর থেকে জলপ্রপাতের মতো হঠাৎ খাদে নেমে আসা জলঢাকা নদীর শোঁ শোঁ শব্দ। সেই আওয়াজ রাতের সমস্ত নির্জনতাকে খানখান করে দিত। আবার সকালের সোনালি রোদ্দুরে পাহাড়টাকে অদ্ভুত শান্ত-সৌম্য মনে হত। এইভাবে জীবনের মোড় ঘুরে কেমন যেন শৈশব থেকে কিশোরীবেলায় পৌঁছে গেলাম। কলেজে দুই বিনুনি দুলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই দেখলাম বড় হয়ে গিয়েছি। তারপরই বৈবাহিক সূত্রে মালবাজার শহরে চলে আসা। তখন মালবাজার পঞ্চায়েতের অধীনে।

এখন অবশ্য মাল পুরসভা। মালবাজার মহকুমার চারদিকে চা-বাগান, মাঝখানে মাল শহর। নিউ মাল স্টেশন থেকে ওই দূরে পাহাড়টা এত সুন্দর লাগে! সবুজ বনানী, চা-বাগান, কমলালেবুর মন মাতাল করা গন্ধ নিয়ে চলা ডুয়ার্সের এক অনুপম সরল জীবনযাপন, যার হাত ধরে চলতে চলতে পৌঁছে গেলাম জীবনের মধ্যগগনে। এইভাবে সবুজ ছুঁয়ে জীবনের পথ চলতে চলতে আজ মনে হয়, ভাল আছি, ভাল থাকব। জীবনে অনেক পাওয়া-না পাওয়ার মধ্যেও এইভাবে ভাল থাকা যায়।

মীনাক্ষী ঘোষ

রূপসী ডুয়ার্স

কেশই সৌন্দর্যের চাবিকাঠি

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান মালা দাস

এই পর্বে আমরা মুখের আদল অনুযায়ী চুলের স্টাইল নিয়ে আলোচনা করব। কারণ চুলই মুখের চালচিত্র।

চুল আপনার গোলাম এখন। এই কথাটা বলতেই মনে পড়ল আমার বান্ধবীর মেয়ের কথা। ওর সোজা চুল। কিন্তু ওর প্রতিদিন চুল নিয়ে সমস্যা। কিনা ওকে এই চুল মানায় না। ওকে দেখতে ভাল লাগে না। এটা এমন কিছু সমস্যাই না যখন খুশি চুলের স্টাইল বদলান যা বর্তমানে সোজা চুল কোঁকড়া করা যায় আর কোঁকড়া চুল সোজা করা যায়। তবে করবার আগে চুল কী ধরনের, মুখের আদল কী, রং করা আছে কিনা (চুল কোঁকড়া করাকে পার্ম করা বলে) দেখতে হবে। পার্ম বা সোজা করার পর অনেক সতর্ক থাকা উচিত। বাজারে এর জন্য আলাদা শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার পাওয়া যায়। এই স্টাইল করবার পর হেনা লাগাবেন না। তবে নিজে করবার চেষ্টা করবেন না। কোনও বিউটিশিয়ানের সাহায্য নিন। তিনি মুখের আদল অনুযায়ী বা চুলের স্টাইল অনুযায়ী এবং বয়স অনুযায়ী আপনার হেয়ার স্টাইল করে দেবেন। এবং কোন পোশাকের সঙ্গে কী রকম চুল কাটবেন বা বাঁধবেন এটাও বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে যাবার আগে চুলে কার্লার লাগিয়ে রাখুন, ঠিক যাবার আগে খুলে আলতো করে আচড়ে চলে যান। মাঝেমধ্যে নিজেকে অন্যভাবে দেখতে ভাল লাগবে।

গরমকালে ঘামে গরমে কিছু করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু পার্টিতে যেতেই হবে। সেক্ষেত্রে অন্য ধরনের চুল কাটুন এবং রং করুন। যা আপনাকে সবার থেকে আলাদা করে তুলবে। বড় চুল কাটতে না চাইলে নানা কায়দায় চুল বাঁধুন। চুলে রং করতে না চাইলে হেয়ার মাসকারা লাগান। ঘাড়ের কাছে পর্যন্ত কিংবা তার চেয়ে একটু বেশি লম্বা চুল হলে ফেদার কিংবা লোয়ার কাট করতে পারেন।

এখন চুলের স্বাস্থ্য সৌন্দর্যের কথা বলছি। কারণ আধুনিক কেশ বিন্যাসে আসতে গেলেই আপনার চুল কেমন সবটা তার উপর নির্ভর করবে। তাই চুলটা ভাল করার কিছু কথা বলা গেল— এবার দেখতে হবে আপনার মুখের জৌলুস।

চুল মুখের চালচিত্র— তাই যখন চুল কাটবেন মুখের আদলের কথা মাথায় রেখে। যেমন ডিম্বাকৃতির মুখে সবরকম হেয়ার স্টাইল মানায়। কিন্তু যদি গোল হয় সেই ক্ষেত্রে চুল লম্বা রেখে স্টাইল করতে হবে। অথবা ব্লান্ট কাট ভাল লাগবে। ফেদার কখনই না।

আমি আবার বলছি— মুখ অনুযায়ী হেয়ার স্টাইল করতে বিউটিশিয়ানের পরামর্শ নিন।

আজকাল কর্মরতা মহিলারা বড় চুল রাখতে পারেন না। তারা ছোট করে রাখতে চান। তবে আমার মনে হয় লম্বা সুন্দর ও সুস্থ চুল ভগবানের দান। তাকে যতদিন রাখা যায়। এখনও লম্বা সুন্দর চুল দেখলে লোক ফিরে ফিরে দেখে। সব কিছুর মধ্যে নিজেকে কেশবতী করতে— সুষম খাদ্য খান, ব্যায়াম করুন, জল প্রচুর পরিমাণে পান করুন।

সর্বোপরি মনকে ভাল রাখুন ও আনন্দে থাকুন। আপনার উপযুক্ত কেশ বিন্যাস করে আপনি আপনাকে করে তুলুন অপরূপা। এখন কোন্ মুখে কেমন হেয়ারস্টাইল হবে তার কিছু টিপস্ দেওয়া হল—

লম্বা মুখ— চুল যথাসম্ভব ছোট রাখতে হবে, কেননা লম্বা মুখে লম্বা চুল আপনার পুরো চেহারায় জল ঢেলে দেবে। মুখ প্রশস্ত ও চওড়া দেখাতে কপালের কাছে চুল ছড়িয়ে রাখবেন। হালকা বা ঘন ফ্রিঞ্জ এমন মুখে ভাল দেখাবে, মুখের দৈর্ঘ্য অনেক কম দেখাবে।

গোল মুখ— আপনার চুলের দৈর্ঘ্য হওয়া উচিত থুতনির ঠিক নিচ পর্যন্ত। চুলের স্টাইল লম্বাটে রেখে মাঝখানে সিঁথি কাটুন। চুলে কার্লস, ওয়েভ কিংবা ফ্রিঞ্জ এড়িয়ে চলুন। এমন মুখে আদর্শ হল ব্লান্ট কাট। ফেদার কাট? নৈব নৈব নেভার।

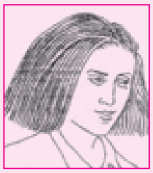

চৌকো মুখ— চৌকো মুখে ফ্রিঞ্জ বা কার্লস মুখের চৌকো ভাব অনেকটা কমিয়ে দেয়। কপালের সামনের চুল ছোট ছোট করে কাটুন। চুল যাতে যথেষ্ট ফাঁপানো দেখায় সে দিকে নজর রাখুন। প্রয়োজনে হালকা পার্ম করিয়ে নিতে পারেন।

পানপাতা মুখ— এমন মুখে কপালের কাছে হালকা আর কানের নিচে ঘন চুল সবচেয়ে বেশি ভাল মানায়। এমন মুখে মাঝখানে সিঁথি মানায় না। এতে আপনার তীক্ষ্ণ থুতনি আরও বেশি গুরুত্ব পাবে।

সরু থুতনি— চুলের দৈর্ঘ্য হওয়া উচিত চোয়াল অবধি। এতে আপনার সরু থুতনি ঢাকা পড়ে যাবে।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেলে।

AANGONAA
Ladies Beauty Clinic
Shahnaz Herbal • Aroma Therapy
Lotus Professional • Lotus Ultimo
Cheryl's Cosmeceuticals (Hair & Skin)
Loreal Professional
Schwarzkopf Professional
7 Bagha Jatin Road, Siliguri 734001
Satyajit Sarani, Shivmandir
Call : 9434176725, 9434034333

ডালবড়া-শুক্তো

উপকরণ- করলা, সজনে, আলু, পটোল, ঝিঙে, কুমড়ো, বেগুন, মটর ডাল, আদা, রাঁধুনি, তেজপাতা, নুন, চিনি, সাদা তেল ও কালো জিরে।

প্রণালী- মটর ডাল সারারাত ভিজিয়ে শুকনো করে বেটে নিতে হবে। তারপর বাটা মটর ডালের মধ্যে নুন ও কালো জিরে দিয়ে ফেটিয়ে নিয়ে সাদা তেলের মধ্যে ছোট ছোট করে বড়া ভেজে রাখতে হবে। এক চা-চামচ বাটা মটর ডাল রেখে দিতে হবে, পরে লাগবে। সব সবজি একটু লম্বা লম্বা করে কাটতে হবে। করলা পাতলা গোল করে কেটে হলুদ, নুন মাখিয়ে ভেজে রাখতে হবে। এবার উনুনে কড়াই বসিয়ে দিন। কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে আদা ও তেজপাতা ফোড়ন দিন। ভাজা হয়ে গেলে প্রথমে বেগুন দিন। বেগুন ভাজা হয়ে গেলে সব সবজি দিয়ে আরও একটু ভাজা ভাজা করে জল ঢেলে নুন ও সামান্য চিনি দিন। জল ফুটে সবজি আধসেদ্ধ হয়ে গেলে বড়াগুলি দিয়ে দিন। এবার সবজি পুরো সেদ্ধ হয়ে গেলে সামান্য রাঁধুনি বেটে এক চামচ মটর ডালের সঙ্গে সামান্য জল দিয়ে গুলে কড়াইতে দিয়ে দিন। এর পর সামান্য নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন।

রত্না গোস্বামী, তেঁতুলতলা, কোচবিহার

শখের বাগান

টবে লাগান হাস্নুহানা

বীরুৎ জাতীয় গাছ হাস্নুহানা। যেমন সুন্দর নাম ফুলও তেমনি সুন্দর। এক রাতের ফুল সাদা রঙের। মাটিতে ডাল পুঁতলেই চারা গজাবে। বাড়িতে একটুখানি জায়গা থাকলেই হল। দিন না একখানা ডাল পুঁতে। ফুল ফুটলে সারা বাড়িময় সুগন্ধে ম-ম করবে। সন্ধ্যায় ঘরের জানালা খুলে দিন। ঘরের ভিতর সুগন্ধে ভরে উঠবে। কোনও সুগন্ধী ধূপকাঠি জ্বালাতে হবে না। বছরে দু-তিনবার ফুল ফোটে। বসন্তকালে একবার ফুল ফুটে শেষ হয়ে যাবার পর সারা বর্ষাকাল গাছ ভরে ফুল ফুটবে। লবঙ্গের মতো দেখতে ছোট ছোট সাদা মঞ্জরী ভরে থোকায় থোকায় ফুল ফোটে। পাতা লঙ্কা পাতার মতো লম্বাটে তবে বেশ বড়। পাতার রং গাঢ় সবুজ। সরু সরু ডাল লম্বা হয়ে চারপাশে ঝুঁকে থাকে। মাটিতে লাগালে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন নেই। একটু ছায়া জায়গা হলে জল দেবারও দরকার নেই। ফাঁকা জায়গায় থাকলে প্রচণ্ড গরম থাকলে মাঝে মাঝে সকালে বা বিকেলে গোড়ার মাটি ভিজিয়ে দিলেই হল। টবে লাগালে বারো ইঞ্চির টবে লাগালেই ভাল। টবের গাছে অবশ্য বছরে একবার গোড়ার মাটি পালটে নতুন মাটি দিলে খুব ভাল ফুল ফুটবে। পারলে পাঁচ-ছ'মুঠো গোবর সার দিলে খুব ভাল হয়। সারা রাত থেকে ভোরবেলা শিউলি ফুলের মতো একটা একটা করে ঝরে পড়ে।

নিঝুম ঠাকুর

টেক টক

প্রয়োজনীয় কিছু কি-বোর্ড শর্টকাট

আমরা যারা কম্পিউটার ব্যবহার করি, তারা প্রায় প্রত্যেকেই Keyboard-এর Alt+F4 এবং Ctrl+C— এই দু'টি Shortcut কী কাজ করে, সেটা জানি। এ ছাড়াও কিছু Shortcut key আছে, যেগুলো advance user-রা ব্যবহার করে থাকেন। এখানে কিছু টিপস দিলাম, যার সঠিক ব্যবহার আপনার সময় ও খাটুনি লাঘব করবে।

১) Windows key+D: এই shortcut key-র মানে 'Show the Desktop'. সমস্ত কিছু minimize করে সোজা Desktop-এ পৌঁছাবে।

২) Ctrl+Shift+Esc: এই Shortcut সরাসরি Task Manager open করে। Windows XP বা তার আগের version-এ 'Alt+Ctrl+Del'— এই Shortcutটি একই কাজ করত, কিন্তু Windows 10, Windows 8 and Windows 7-এর ক্ষেত্রে এটা lock this computer screen খুলে দেয়।

৩) Ctrl+Click: এই shortcut-টি খুব কাজের, যদি background tab-এ আপনি কোনও Program open করতে চান।

৪) Alt+Print Screen: এটি Print Screen-এর মতো সম্পূর্ণ screen-এর screenshot না নিয়ে শুধুমাত্র active screen-এর snapshot নেয়।

৫) Shift+Click: Yes to All and No to All-এর জন্য। যদি অনেকগুলো Dialog box একসঙ্গে Yes বা No করার জন্য প্রশ্ন করে, তবে শুধুমাত্র shift+click Yes অথবা No করলে সব ক'টাই একসঙ্গে Yes অথবা No হবে।

৬) Ctrl+C: এটি যে কোনও কিছু copy করার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

৭) Ctrl+T: এই keyboard shortcut internet browsers-এর নতুন একটি Tab খুলে দেয়।

৮) Ctrl+Shift+T: শেষ বন্ধ হওয়া Tab খুলে দেয়।

৯) Ctrl+Shift+N: এই shortcut Google Chrome নতুন incognito window খুলে দেয়। Incognito window-তে কোনও History, Cookies, Search history save করে না।

১০) Alt+Enter address bar-এ ওয়েবসাইটের নামের পরে .com নিজেই বসিয়ে নেবে।

১১) Shift+Enter Address bar-এ

ওয়েবসাইটের নামের পরে .net নিজেই বসিয়ে নেবে।

১২) Ctrl+W-এর ব্যবহারে browser-এ খুলে থাকা tab বন্ধ হবে সঙ্গে সঙ্গে।

১৩) Ctrl+Backspace-এর ব্যবহার ভুল করে লিখে ফেলা একটা গোটা শব্দকে চটজলদি মুছে ফেলতে পারে।

১৪) Ctrl+Left or Right Arrow key-র ব্যবহারে cursor সব সময় একটি character-এর পরিবর্তে একটি করে শব্দকে অতিক্রম করে চলতে থাকে।

১৫) Ctrl+ -এর ব্যবহারে browsers-এ খুলে থাকা web pages-এর লেখা বা ছবি কাছে আনে বা আকারে বড় করে (zoom in)। কোনও Page-এর লেখা যদি খুবই ছোট হয়, সে ক্ষেত্রে এর ব্যবহার প্রযোজ্য। একই ব্যবহার mouse-এর ক্ষেত্রে Ctrl+Scroll wheel দ্বারা সম্ভব।

১৬) Ctrl+ -এর ব্যবহার উপরের command-এর ঠিক উলটো কাজ করে, অর্থাৎ সব কিছুকে ছোট করতে থাকে (zoom out)।

১৭) Ctrl+0-র ব্যবহার web page-এর zoom reset হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছাবে।

১৮) Windows key+M-এর ব্যবহারে খুলে থাকা সব ক'টি windows Minimize হবে।

১৯) Ctrl+L-এর ব্যবহারে cursor এক লাফে পৌঁছাবে web browser-এর address bar-এ।

২০) Ctrl+Shift+Delete: এই shortcut internet browser-এর History, Cookies, Cache এবং অন্যান্য details delete করতে সাহায্য করে।

২১) Windows Key+L: এটা সরাসরি windows-এর screen lock করে দেয়।

২২) Ctrl+B: যে কোনও অক্ষরকে মোটা (Bold) করে।

২৩) Ctrl+U: যে কোনও অক্ষরকে Underline করে।

২৪) Ctrl+I: যে কোনও অক্ষরকে Italic করে।

২৫) F2 যে কোনও file-কে rename করতে দেয়।

২৬) Holding Shift যখন পেন ড্রাইভ বা সিডি/ডিভিডি ঢোকাবেন, automatic run হতে দেবে না।

২৭) Ctrl+F: এই keyboard shorcut যে কোনও Program-এর Find option খুলে দেয়।

২৮) Ctrl+S: চটপট Save করে।

২৯) Ctrl+Home and Ctrl+End: দ্রুত পেজের একদম উপরে ও নিচে যেতে ব্যবহার করা হয়।

৩০) Ctrl+P: সরাসরি Print ডায়ালগ বক্স খুলে দেয়।

৩১) Space Bar: যখন ওয়েব পেজ দেখছেন, তখন space bar প্রেস করলে পেজ নিচের দিকে নামতে থাকে।

৩২) Alt+Tab: এটা যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো চলছে, তার একটা তালিকা দেখাবে। এবার Alt চেপে Tab প্রেস করতে থাকলে এক-এক করে অ্যাপ্লিকেশন সিলেক্ট করে ওপেন করা যাবে।

৩৩) Ctrl+Tab: এটা internet browser-এর খোলা Tab-গুলি এক-এক করে সিলেক্ট করে।

৩৪) Alt+Double Click: ফাইলের properties খুলে দেয়।

ডুয়ার্স বিষয়ক পুঁথিপুস্তক

১) ডি এইচ (১৮৮৯) স্যান্ডাসির রচিত সেটেলমেন্ট রিপোর্ট
২) স্টোরি অফ ডুয়ার্স অ্যান্ড ভোটার ওয়ার— ডা. ডেভিড ফিল্ডরেনি
৩) মেটেলমেন্ট রিপোর্ট— জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, হান্টার রচিত
৪) ট্রিজ অফ ডুয়ার্স অ্যান্ড টেরাই, ভি এস রাও কনজারভেটর অফ ফরেস্ট (১৯৫৭)
৫) ইমপর্টেন্ট ডকুমেন্টস অ্যান্ড ডেসক্রিপশন অফ বার্ডস, রিভার, ট্রিজ, টপোগ্রাফি অফ নেওরা ন্যাশনাল পার্ক ডা. ব্রিজলাল শর্মা আই এফ এস
৬) লাইফ ইন অ্যান ইন্ডিয়ান আউটপোস্ট, মেজর গর্ডন কেজারলি, (রাজাভাতখাওয়া, বক্সা জয়ন্তী বিষয়ক)
৭) হিমালয়ান জার্নালস (২ খণ্ডে), ড. জোশেফ ডাল্টন হুকার
৮) বি টি আর জার্নালস (বক্সা বাঘবনের) সম্পাদক সম্পদ সিং বিস্ট, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়— এখন বন্ধ
৯) জলপাইগুড়ি ডিমট্রিটগেজেট— অবনী মোহন কুমারী ও অন্যান্য ১৯৮১
১০) দ্য টোটোস— ডা. চারুচন্দ্র সান্যাল, মেচেস অ্যান্ড রাজবংশী অফ হর্নবেসল— ডা. চারুচন্দ্র সান্যাল
১১) ডুয়ার্সে দুই দিন— হরগোপাল দাস কুণ্ডু (মানস-মর্মবাণী পত্রিকা)
১২) স্মরণের জাদুঘরে— হেমেন্দ্র রায় (জয়ন্তী জঙ্গলে বেড়ানোর বিবরণ, রেলপথ সৃষ্টি হওয়ার আগে)
১৩) অরণ্যপথে প্রবোধকুমার সান্যাল (আলিপুরদুয়ার, মাঝেরডাবরি, শামুকতলা, শিকারপুর, বিখ্যাত শিকারী ক্ষুদু মুখার্জি, নানা বিষয়)
১৪) ডুয়ার্সের পথে পথে— পরিমল গোস্বামী
১৫) ডুয়ার্স প্রাঙ্গণে— অনিল গঙ্গোপাধ্যায়
১৬) অরণ্য দুর্গছায়ায়— পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, চিলাপাতা, গড়মেন্দাবাড়ি বিষয়ে
১৭) কেল্লা দুর্গ পশ্চিমবাংলার গড়— নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়
১৮) জঙ্গলে পাহাড়ে— শক্তি চট্টোপাধ্যায়
১৯) চলো বেড়িয়ে আসি (১ম/২য়) খণ্ড—শক্তি চট্টোপাধ্যায়
২০) তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স— বেণু দত্ত রায় (বহুকাল ছাপা নেই)
২১) জলপাইগুড়ি শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ— ১৮৬৮-১৯৬৮
২২) কিরাতভূমি— সম্পাদক অরবিন্দকর, জলপাইগুড়ির ১২৫ বর্ষপূর্তিতে, ১ম/২য় খণ্ড
২৩) জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা— পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা ২০০১
২৪) জলপাইগুড়ি জেলার পুরাকীর্তি— তারাপদ সাঁতরা
২৫) মধুপর্ণী— জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, মূলস্তম্ভ অজিতেশ ভট্টাচার্য
২৬) স্মরণে মননে আমার জলপাইগুড়ি— শচীন্দ্র নারায়ণ সেন মজুমদার
২৭) সেকালের জলপাইগুড়ি শহর— কামাখ্যাপ্রসাদ চক্রবর্তী
২৮) উত্তরবঙ্গ— বীরেন সাহা
২৯) চোমংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ (ছাপা নেই বহুকাল)
৩০) উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক অধিকার— পরিতোষ দত্ত
৩১) উত্তরবঙ্গের চিঠি— রণজিৎ দেব
৩২) উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি— বিশ্বনাথ দাস
৩৩) উত্তরবঙ্গ পরিচয়— অশোক গঙ্গোপাধ্যায়
৩৪) জলপাই ডুয়ার্সের জলছবি— অর্ণব সেন, ব্রজগোপাল ঘোষ
৩৫) পর্যটন সংখ্যা— পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা— ২০০১
৩৬) উত্তরবাংলার জাতি-উপজাতি— রতন বিশ্বাস
৩৭) মাটির ছোঁয়া (আলিপুরদুয়ার সংখ্যা)— পবিত্রভূষণ সরকার
৩৮) ময়নাগুড়ি— অতীত বর্তমান প্রকাশক জর্দন ভ্যালি স্পোর্টিং ক্লাব
৩৯) গেটওয়ে অফ ডুয়ার্স (বাংলায়), সম্রাট চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি পর্যটন বিকাশ কমিটি
৪০) যোগেশ জীবন (১৮৭৯-১৯৩৪)— জলপাইগুড়ির পুরনো স্মৃতি চিত্রণ, চা-বাগান বিষয়ক আলোচনা
৪১) বনপাহাড়ের ডাক— সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়
৪২) বোম্বাই ভেলপুরী ও অন্যান্য (ডুয়ার্স বিষয়ক আলোচনা কিয়দংশ)
৪৩) বাংলায় রেলভ্রমণ— ডুয়ার্স বিষয়ক অংশ
৪৪) ঐরাবতের মৃত্যু— দীনেশ রায়, পটভূমি মহাকালগুড়ি, চতুরঙ্গ পত্রিকা
৪৫) তিস্তাপারের বৃত্তান্ত— দেবেশ রায়
৪৬) উত্তরাধিকার (উপন্যাস)— সমরেশ মজুমদার
৪৭) তিস্তা তটরেখা— সমীরণ দত্ত
৪৮) ভ্রমণ কাছে-পিঠে— বারিদবরণ ঘোষ
৪৯) মেচ রাভাদের সম্পর্ক মূল্যবান প্রবন্ধ সমূহ— সুনীল পাল
৫০) প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের জনজাতি— প্রমোদ নাথ
৫১) ডুয়ার্সের আদিবাসী সাহিত্য চর্চা— প্রমোদ নাথ
৫২) মেঘের গায়ে জেলখানা— তুষার প্রধান/চিত্রভানু সরকার
৫৩) বক্সা স্মারক গ্রন্থ— স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর, সম্পাদক রতন মুখোপাধ্যায়, সরকারি উদ্যোগে
৫৪) অরণ্যের টানে— চিন্ময় চক্রবর্তী
৫৫) আলিপুরদুয়ারের পথে প্রান্তরে— শোভেন সান্যাল
৫৬) বক্সাদুয়ার বিশেষ সংখ্যা— ডুয়ার্স সমাচার— রমেন দে
৫৭) বিহনে-উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক— সম্পাদক জগন্নাথ ঘোষ
৫৮) ডুয়ার্সের আদিবাসী, চা-শ্রমিক সমাজ সংস্কৃতি— ড. সমীর চক্রবর্তী
৫৯) পর্যটনে উত্তরবঙ্গ— বৃন্দাবন ঘোষ
৬০) মেচ সমাজ সভ্যতা— হীরাচরণ নার্জিনারী
৬১) হুলং সানসাই উপকথা— অমীয়ভূষণ মজুমদার
৬২) দূরে কোথাও— সূর্য ঘোষ
৬৩) পথে চলে যেতে যেতে— প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত
৬৪) আদিবাসী প্রতিবেশী— বিমলেন্দু মজুমদার
৬৫) উত্তরবঙ্গ— ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ
৬৬) উত্তরবঙ্গের ইতিহাস— সমিত ঘোষ
৬৭) অরণ্যের জার্নাল— শুভ্রনীল দে
৬৮) অরণ্যের এপিটাফ— শুভ্রনীল দে
৬৯) ছুটির ঠিকানা— রমেশ দাস/সৌম্যকান্ত শাসমল
৭০) ডেস্টিনেশন আনলিমিটেড-এক ডজন ভ্রমণ— অরিন্দম মুখোপাধ্যায়
৭১) সবুজের নেশা— বলরাম বসু
৭২) ডুয়ার্স অফুরান ভালোবাসার গল্প— অরুণাভ দাস
৭৩) ডুয়ার্স তরাই সবুজ স্বপ্নের দেশ— অরুণাভ দাস
৭৪) ইতিবৃত্তের আলোয় ডুয়ার্স— পার্থ ঘোষ দস্তিদার
৭৫) বেড়াতে চলুন ডুয়ার্স— গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
৭৬) চলুন বেড়াই ডুয়ার্স-তরাই— গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
৭৭) উত্তরবঙ্গের পথে পথে— গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
৭৮) ডুয়ার্স বিচিত্রা— দিগ্বিজয় দে সরকার
৭৯) মোহময়ী ডুয়ার্স— অপূর্ব ঘোষ
৮০) অন্য চোখে— বুদ্ধদেব গুহ
৮১) পশ্চিমবঙ্গের ভ্রমণ ও দর্শণ— ভূপতিরঞ্জন দাস
৮২) ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ— কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য
৮৩) ডুয়ার্সের বন ও বন্যপ্রাণী— জগন্নাথ বিশ্বাস

এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, কাজ চলছে, তৈরি করছেন গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-2, WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

রংরুট ও এখন ডুয়ার্সের বই

এখন ডুয়ার্স-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন

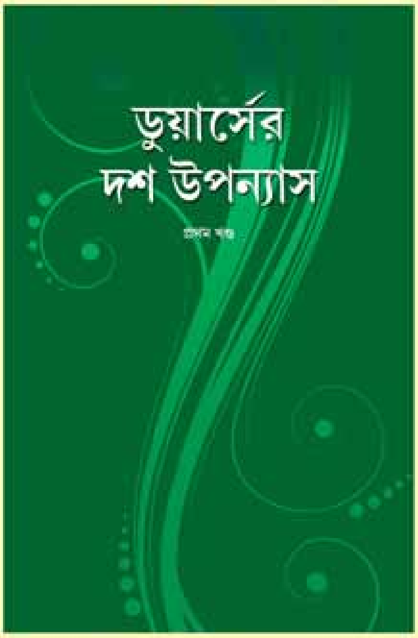

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা।

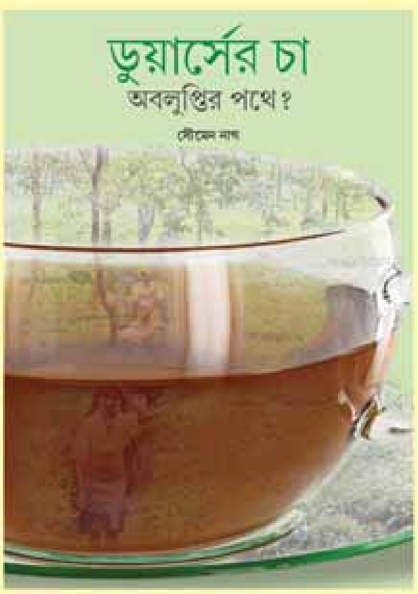

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ মূল্য ১৫০ টাকা।

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান
আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

পাসপোর্ট প্রতিবেশীদের পাড়ায়
দীপিকা ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

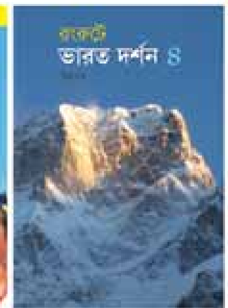

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
মূল্য ২০০ টাকা

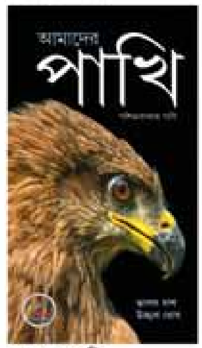

আমাদের পাখি
তাপস দাশ, উজ্জ্বল ঘোষ
মূল্য ১০০০ টাকা, বইমেলায় ৬৯০ টাকা

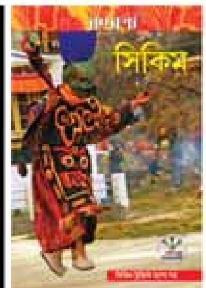

রংরুট সিকিম। রংরুটে প্রকাশিত সিকিম সম্পর্কিত রচনার সংকলন দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। সঙ্গে সিকিমের পূর্ণাঙ্গ টুরিস্ট ম্যাপ।
মূল্য ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

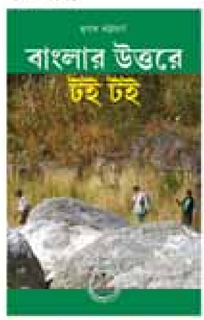

বাংলার উত্তরে টই টই
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মূল্য ১০০ টাকা।

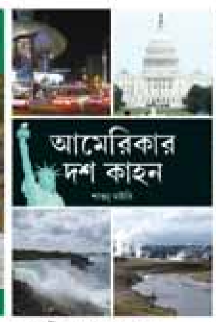

আমেরিকার দশ কাহন
আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড
শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

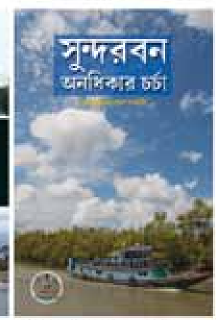

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
মূল্য ১৫০ টাকা

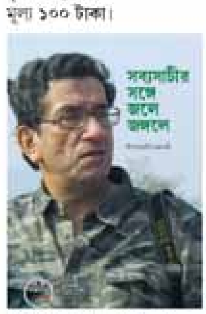

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী
সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি
মূল্য ১৫০ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুট পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক পর্যটন গাইড
মূল্য ১০০ টাকা

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.